দার্শনিক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ) ও তাঁর চিন্তাধারা

জুলফিকার আহমদ কিসমতী

দার্শনিক শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (রহ্)
ও তাঁর চিন্তাধারা

জুলফিকার আহমদ কিস্‌মতী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২০৩

২য় প্রকাশ

জমাদিউল আউয়াল	১৪২১
ভাদ্র	১৪০৭
আগস্ট	২০০০

বিনিময় ঃ ১৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

DARSHANIK SHAH WALIULLAH DEHLAVEE (RH) O TAR CHINTADHARA Philosopher Shah Waliullah Dehlovee and his thanghts. by Zulfiqar Ahmad Kismati. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.
Phone : 711 51 91

Price : Taka 15.00 Only.

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকরা দীর্ঘদিন রাজত্ব করলেও এবং তাঁদের কেউ কেউ অল্প বিস্তর ইসলাম প্রচারে সহযোগিতা করলেও তাঁদের অনেকেই সত্যিকার ইসলামকে জনগণের মধ্যে প্রচার করেননি। প্রচার করেননি শুধু তাই নয় বরং ইসলামকে বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে, অপব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কোন কোন শাসক নিজের কায়েমী স্বার্থকে মজবূত করার জন্যে অপরকে খুশি করতে গিয়ে নিজস্ব মতাদর্শে নতুন ধর্ম চালু করার চেষ্টা করে ইসলামের বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। ইসলামের এ বিপর্যয়ের মাঝে মুজাদ্দিদে আলফেসানীর আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি উপ-মহাদেশে ইসলামের মূল আদর্শকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন। মোঘল সাম্রাজ্যের পতন কালে ও তার পতনের পর ইসলাম পুনরায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সে সময় যে মহাপুরুষ তাঁর অসামান্য মেধা, দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও সাধনা দ্বারা ইসলামের পুনরুজ্জীবন ঘটান এবং বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন তিনি হলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (রহ)। মওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী এ পুস্তকে উক্ত মহাপুরুষের মহামূল্যবান জীবন ও জীবনাদর্শ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বইটি মোগল শাসনের পর গোটা হিমালয়ান উপমহাদেশে ইসলামী পুনঃর্জাগরণের উদ্‌গাতা শাহ ওয়ালিউল্লাহর আদর্শ, চিন্তাধারা ও ইসলামের জন্য তাঁর অমর অবদানকে জানতে সবাইকে সাহায্য করবে। আমাদের আশা, পাঠক এ গ্রন্থ পাঠে ইতিহাসের একটি যুগসন্ধিক্ষণে একজন মহাপুরুষের অমর কীর্তি অবলোকন করে সেই আদর্শে নিজে দীক্ষিত হবেন এবং তাঁর চিন্তাপ্রসূত ইসলামী রেনেসাঁর বর্তমান সম্প্রসারিত অবস্থায় এর লক্ষ্য অর্জনে তৎপর হবেন।

www.amarboi.org

লেখকের কথা

ব্যক্তি জীবনে যেমন মানুষের উত্থান-পতন আসে, সমাজ জীবনেও তেমনি উত্থান-পতন দেখা দেয়। পার্থক্য এই যে, একটির শুভ কিংবা অশুভ পরিণতি থাকে সীমিত অপরটির পরিণতি অসংখ্য মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। পৃথিবীর কোন না কোন দেশ বা সমাজে সব সময়ই উত্থান-পতন চলছে। কোন জাতি দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আবার কোন জাতিকে নিজের স্বকীয়তা হারিয়ে অবনতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হতেও দেখা যায়। এ অবনতি ও অগ্রগতির পেছনে কতকগুলো কার্যকারণ থাকে। সে সকল কার্যকারণ সম্পর্কে অবগতি একান্ত জরুরী। কেননা, যে জাতি অতীতের ব্যর্থতা-সফলতার ইতিহাসকে সামনে না রাখে, সে কিছুতেই নিজের চলার পথের সার্বিক দিশা পায় না। তবে এ সকল কার্যকারণ সময় মতো যথারীতি চিহ্নিত করা ও জাতির সামনে উপস্থাপিত করা সহজ ব্যাপার নয়। এটা সম্ভব হলেও অগণিত দেশবাসীর হৃদয়-কন্দরে এর লব্ধ জ্ঞানের শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে জাতির পুনর্জাগরণ আনয়ন সত্যই কঠিন কাজ বটে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যারাই জাতীয় পুনর্জাগরণের ভিত্তি রচনা করেছেন, তারা জাতির দিকপাল হয়ে ইতিহাসে চিরদিন অমর হয়েই কেবল থাকেন না তাঁদের থেকে অনাগত দিনের মানুষও সকল সময় অনুপ্রেরণা পায়।

এ উপমহাদেশে মুসলিম আধিপত্যের অবসানের পর মুসলমানদের মধ্যে নৈরাশ্য, লক্ষ্যহীনতা ও জাতীয় স্থবিরতা দেখা দেয়। সে সময় মুসলমানদের জাতীয় পুনর্জাগরণের পটভূমি রচনা করেন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী। উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণে অন্যান্যেরও দান রয়েছে। কিন্তু স্থায়িত্ব, ব্যাপকতা ও গভীরতার দিক থেকে তাঁর অবদানই শ্রেষ্ঠ। তবে এ মহাপুরুষের অবদান সম্পর্কে বাংলা ভাষায় তাঁর জীবনী, শিক্ষা ও আদর্শের যেরূপ ব্যাপক আলোচনা, প্রচার ও প্রসার ঘটার দরকার ছিল তা হয়নি। মুষ্টিমেয় অনুসন্ধিৎসু শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে কিছুটা জানলেও সাধারণভাবে তাঁর জীবনী ও দর্শনে এখানে আলোচিত হয়নি। আবার অনেক আধুনিক শিক্ষিত লেখককে তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগতির অভাবে

www.amarboi.org

তাঁর সম্পর্কে ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন করতেও দেখা যায়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ডের একটি ইতিহাস পুস্তকের কতিপয় তত্ত্ব ও তথ্যগত ভ্রান্তি আমার লেখা 'আযাদী আন্দোলনে আলেমদের সগ্রামী ভূমিকা' (১ম সংস্করণ) পুস্তকের ৮–১১ পৃষ্ঠায় সপ্রমাণ উল্লেখ করেছি। বহু পরিশ্রমের পর বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম লেখক বহু গ্রন্থ প্রণেতা সাহিত্যিক সাংবাদিক মরহুম মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী ও মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব তাঁর বিশ্ববিক্ষাত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'র অনুবাদ করেছেন শুনেছি। স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান তাঁদের দ্বারা এর অনুবাদ করালেও পরবর্তী অপর কোন পরিচালকের অবহেলায় বা অন্য কারণে তা আজও প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য এদেশের আলিম সমাজের মধ্যে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র নাম ও তাঁর প্রতি সম্মানের কোন অভাব নেই। একজন আধ্যাত্মিক আলিম ও ইসলামী জ্ঞান–বিজ্ঞানে পারদর্শী ইমাম হিসেবে আলিম সমাজে তাঁর যথেষ্ট মর্যাদা ও খ্যাতি আছে। উপমহাদেশে হাদীস শিক্ষার প্রসার ও ব্যাপকতা দানে তাঁর ও তাঁর পরিবারের লোকজনদের প্রশংসা বহু শোনা যায়। কিন্তু তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ ইসলামী দার্শনিক চিন্তানায়ক এ উপমহাদেশে 'হুকুমতে ইলাহীয়া' প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের বীজ বপনকারী আধুনিক সমাজের কাছে ইসলামী অনুশাসনসমূহের ব্যাখ্যাদানে তাঁর যুক্তিদর্শন বিশেষ উপযোগী তাঁর জীবনের সেই দিকটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়নি।

বইটিতে এ মহাপুরুষের জীবনী ও শিক্ষা আদর্শ সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে এ উপমহাদেশে শেষ মোগল শাসকদের আমলে মুসলিম আধিপত্যের অবসান ঘটার পর ইংরেজ প্রভুত্ব ও বিভিন্ন কুসংস্কার, ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও মুসলিম সমাজের শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও কি করে তাঁর চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে ইসলামী পুনর্জাগরণের সূত্রপাত হয় সেদিকটিই বিশেষত আলোচিত হয়েছে। এদেশে ইসলামী জাতীয়তাবোধ ও ইসলামী কৃষ্টি–সংস্কৃতিকে অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে বইটি পাঠকমহলে অনুপ্রেরণার কাজ করুক এটাই কামনা রইল।

www.amarboi.org

সূচীপত্র

দার্শনিক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ)

উপমহাদেশের অবস্থা	১১
একশ্রেণীর আলিমদের ভূমিকা	১২
ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (রহ)	১৬
মক্কায় গমন	১৯
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও গবেষণাকার্যে আত্মনিয়োগ	২১
ওয়ালীউল্লাহর কর্মীদল	২৩
ইংরেজ বিরোধী বিপ্লবী ফতওয়া	২৪
ইংরেজ বিরোধী ফতওয়ার প্রভাব	২৫
শাহ ওয়ালিউল্লাহর কাজ ও চিন্তাধারা	৩১
সমসাময়িক পরিস্থিতির পর্যালোচনা	৩৫
১. সূফীবাদের একটি ত্রুটির সমালোচনা	৩৫
২. অযোগ্য পীর ও পীরজাদাদের কঠোর সমালোচনা	৩৫
৩. শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটির প্রতি নির্দেশ	৩৬
৪. কুরআন-হাদীসের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ	৩৭
৫. ইমাম সাহেবের প্রতি রক্ষণশীল ধর্ম ব্যবসায়ীদের হামলা	৩৭
৬. শাসকদের প্রতি	৩৮
৭. জিহাদের জন্য আহবান ও তার মূল লক্ষ্যের প্রতি নির্দেশ	৩৮
৮. সৈনিকদের উদ্দেশ্যে	৩৯
৯. শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের নৈতিক অবস্থার সমালোচনা	৩৯
১০. আলিম সমাজের প্রতি	৩৯
গঠনমূলক কাজ	৪০
ইজতিহাদ	৪০
তিনিই ইসলামী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা	৪২
শাহ ওয়ালিউল্লাহর সমাজ দর্শন	৪২
অর্থনৈতিক চিন্তাধারা	৪৩

www.amarboi.org

রাজনৈতিক চিন্তাধারা ৪৫
মৌলিক অধিকার ৪৬
ইসলাম একটি বিপ্লবী দীন ৪৬
ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাধারার ফসল ৪৭
বাংলাদেশে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ চিন্তাধারার প্রভাব ৫০
গ্রন্থাবলী ৫৩

ওয়ালিউল্লাহ্ আন্দোলনের প্রধান নেতা শাহ আবদুল আযীয দেহলভী রেহ)

(ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম ফতোয়া দানকারী)

জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা ৫৫
শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর কর্মজীবন ৫৭
শিক্ষার মূলনীতি ৫৭
কতিপয় বিখ্যাত ছাত্র ৫৮
সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ৫৯
সরকারের দুর্ব্যবহার ও তার পটভূমি ৬৩
গুণ্ডামীর সম্মুখীন ৬৪
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ৬৫
নির্বাসন ৬৫
প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র ৬৫
১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পটভূমি ৬৬
জটিল প্রশ্ন ৬৭
কলমের জিহাদ ৬৮
অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে আবদুল আযীয (রহ)-এর আন্দোলনের প্রভাব ৬৯
ওফাত ৬৯
আবদুল আযীয (রহ)-এর জীবনের কতিপয় ঘটনা ৭০
নিয়ম নিষ্ঠা ৭০
উপস্থিত বুদ্ধি ৭১
পাদরীর সঙ্গে ধর্মীয় বিতর্ক ৭২

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দার্শনিক শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহ্লভী (রহ্) ও তাঁর চিন্তাধারা

হিজরী পঞ্চম শতক পর্যন্ত মুসলমানগণ সাহিত্য, সংস্কৃতি, কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, আইনশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, স্থাপত্যশিল্প, রাজ্য জয় তথা বৈষয়িক দিক থেকে সমগ্র বিশ্বে উন্নতির উত্তুঙ্গ চূড়ায় সমাসীন থাকলেও তার পরবর্তীকালে সারা মুসলিম জাহানে চিন্তার বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। বিশেষ করে ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে এমন স্থবিরতা পরিলক্ষিত হয় যে, ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা ও স্বাধীন চিন্তার দ্বার এক রকম বন্ধ হয়ে যায়। এমন কি কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা ও তার ব্যাখ্যার ব্যাপারে কেবল চোখ বুঁজে পূর্ববর্তীদের অনুসরণই করা হতো না বরং অনেক জটিল সমস্যার ক্ষেত্রেও মনে করা হতো যে, এ ব্যাপারে উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর গবেষণার যুগ হিজরী চতুর্থ শতক পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে এবং পরবর্তী লোকদের এ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার কোন অধিকার নেই।

এছাড়া এমনিতেও দেখা যায়, খুলাফায়ে রাশেদীনের পর থেকে চতুর্থ হিজরী পর্যন্ত ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ইমাম-মুজতাহিদগণ এক দিকে বেসরকারী পর্যায়ে ইসলামী চিন্তা-গবেষণায় রত রয়েছেন, অপরদিকে ক্ষমতালোভীগণ ইসলামী মূল্যবোধকে নানাভাবে ব্যাহত করে আসছে। বনী উমাইয়া ও আব্বাসিয়াদের শাসনামলে (উমর ইবনে আবদুল আযীয ছাড়া) ইসলামের সাংস্কৃতিক জীবন এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হয়। গ্রীক সাহিত্য-দর্শনের নির্বিচার তরজমা ও প্রচার মুসলমানদের চিন্তা জগতে এক নৈরাজ্যের সূচনা করে। শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের সাহায্যে সাহিত্য, দর্শন,

www.amarboi.org

রাজনীতি ও তমদ্দুনের ক্ষেত্রে জাহেলী যুগের চিন্তাধারার প্রসারের ব্যবস্থা করে। হিজরী পাঁচ শতকের শেষার্ধে পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, গ্রীক সাহিত্যানুরাগ ও দর্শন-প্রীতির প্রবণতা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যায়। মুসলিম শাসক ও জনগণের আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্রের মারাত্মক অবনতি ঘটে। এক শ্রেণীর আলিম, ফকীহ, মুফতী বিজাতীয় দর্শনের মাপকাঠি দিয়ে ইসলামী জীবন দর্শনের মূল্যায়নে সচেষ্ট হয়। তার পরবর্তী পর্যায়েও দেখা যায় মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অংশে আরও নানাবিধ কুসংস্কার ও বাতিল চিন্তাধারা গজিয়ে উঠেছে। মানুষ এ সময় দমননীতি মূলক রাজতান্ত্রিক পরিবেশে থেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সঠিক রূপরেখা সম্পর্কেই অপরিচিত হয়ে পড়ছিল। মানবজীবনে বিভিন্ন বিভাগের জন্য নির্ধারিত কুরআন ও সুন্নাহর অনুশাসনসমূহ তথা ইসলামের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ বিজয়ী জীবন-বিধান, সাধারণ ভাবে মুসলিম সমাজ থেকে এ ধারণা বিদায় গ্রহণ করছিল। আর তার স্থান দখল করছিল সুফীবাদ তথা ইসলামের আংশিক রূপ-বরং ক্ষেত্র বিশেষে বিকৃত রূপ-যার জের এখনও চলছে এবং এখনও কেউ কেউ আনুষ্ঠানিক কতিপয় ইবাদতকেই পূর্ণ ইসলাম বলে মনে করছে। দোর্দন্ড প্রতাপশালী রাজশক্তির অধীনে ইসলামের বৈপ্লবিক ভাবধারা নিয়ে মাঝে মধ্যে কেউ কেউ এগিয়ে এলেও সমগ্র সমাজের সামগ্রিক নিস্পৃহতা ও নিরাশক্তির সম্মুখে তা সহজেই স্তিমিত হয়ে পড়ে। ঐ ভাবধারা মূলক কোন কিছু বলা ও লেখাও ছিল জীবনের পক্ষে বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার। এ ছাড়া ঐ পরিবেশে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে অনুসৃত কৌশলগত নীতিরও ছিল তা পরিপন্থী। এসব কারণে মহানবী (সা) ও তাঁর ত্যাগী সাহাবীগণ প্রাণান্তকর সংগ্রাম সাধনার দ্বারা জাহিলিয়াতের সকল দুর্ভেদ্য প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মানব জাতির সামনে যে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান পেশ করেছিলেন, ক্রমে তা থেকে মুসলমানদের বিচ্যুতি ঘটতে থাকে।

www.amarboi.org

উপমহাদেশের অবস্থা

একদিকে ইসলামের ব্যাপারে সুষ্ঠু জ্ঞান-গবেষণার অভাব, অপরদিকে নিত্য নতুন ভ্রান্ত চিন্তাধারার উদ্ভব-এ উভয় অবস্থার মধ্য দিয়ে যখন ইসলাম গতিশীলতা হারিয়ে দ্বাদশ হিজরীতে পদার্পণ করে, তখন এই চিন্তার দিক থেকে গোটা মুসলিম সমাজ বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। এখানে স্বার্থদুষ্ট মুসলিম শাসকদের হাতে ইসলাম যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল, তা আর কোথাও হয়নি। কেননা, দুই একজন ছাড়া দিল্লীর মুসলিম রাজা-বাদশাহরা পাক-ভারতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু করা তো দূরের কথা বরং ইসলামী আদর্শের খেলাপ নানারূপ কাজ করে এ দেশের সাধারণ মানুষের সামনে ইসলামের এক বিভ্রান্তিকর চিত্র তুলে ধরে। মোগলদের আমলে বিশেষ করে হিজরী দশম শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে পরিস্থিতির আশংকাজনক অবনতি ঘটে। ইসলামের সঙ্গে সম্রাট আকবরের (৯৬৪-১০৬৪ হিঃ) সীমাহীন ধৃষ্টতা মুসলিম সমাজ জীবনে বিরাট বিষফোঁড়ার সৃষ্টি করে। সম্রাট আকবর যে কোন মূল্যে হিন্দুদের মন রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। আকবরের ধারণা ছিল এই যে, প্রয়োজনে হিন্দুদের সক্রিয় সমর্থন ভিন্ন কেবল মাত্র সংখ্যালঘু মুসলমানদের শক্তির ওপর মোগল শাসন ভারতে দীর্ঘ স্থায়ী হতে পারে না। তাই পূর্বপুরুষদের সিংহাসন সংরক্ষণের জন্য আকবর নিজস্ব জাতীয় তাহযীব-তমদ্দুন এবং ঈমান-আকীদাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন. উপরোক্ত চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আকবর বহু হিন্দু রীতিনীতি গ্রহণ করেন এবং অমুসলমানদের উপর থেকে জিযিয়া কর প্রত্যাহার করেন। তিনি এ সবকিছুই বহু নিন্দিত সেই 'দীনে ইলাহী' নামক নিজের উদ্ভাবিত প্রহসনমূলক ধর্মের নামেই করতেন। উল্লেখ্য যে, ৯৮৩ হিজরী থেকে আকবরের মনে এ দুষ্টামি চেপে বসে এবং এ উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা স্থির করার জন্য এক শ্রেণীর আলিম, পীর ও হিন্দু পন্ডিত ছাড়াও শিয়া, খৃষ্টান, ইয়াহুদী, অগ্নিপূজক প্রভৃতি ধর্মের পন্ডিতদেরও দরবারে হাযির করেন। পরে প্রত্যেকের বক্তব্যের আলোকে নিজ স্বার্থ বুদ্ধিকে কার্যকরী করেন এবং ৯৯০

www.amarboi.org

হিজরীতে 'দীনে-ইলাহী' প্রতিষ্ঠার সরকারী ঘোষণা করেন। আকবরের এই গোমরাহীর পশ্চাতে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার সাথে সাথে তাঁর অমুসলিম বেগমদের গভীর প্রভাবও কাজ করেছিল। হেরেমে হিন্দু রমণীদের অস্তিত্ব গোটা পরিবেশকে হিন্দু বানাবার জন্য যথেষ্ট ছিল। প্রাসাদের অভ্যন্তরে নানা ধর্মের উপাসনালয় নির্মাণ করা হয়। হিন্দু মেলা-তেহারের সময় সম্রাটের প্রাসাদে সাধারণ উৎসব পালন করা হতো। সন্ধ্যা বাতির সময় আকবর দাঁড়িয়ে সম্মান গ্রহণ করতেন। আযান ও গরু যবাই নিষিদ্ধ ছিল। দরবারের লোকদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানী ছিল। মুসলিমদের মুখ থেকে দাড়ি বিলুপ্ত হতে শুরু করলো। এক কথায় সারাটি পরিবেশ, প্রাসাদের যাবতীয় কাজকর্ম, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান একান্তভাবেই হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল। ঐ যুগের পোশাক, স্থাপত্য, চিত্রনির্মাণ সকল কিছুর মধ্যেই হিন্দু সংস্কৃতির ছাপ লক্ষ্য করা যেতো। ফতেহপুর সিক্রির মসজিদ ও শায়খ সলীম চিশতীর সমাধি একইভাবে হিন্দু স্থাপত্যের প্রতীক হিসেবে নির্মাণ করা হয়। শায়খ সলীম চিশতীর সমাধি সম্পর্কে বিখ্যাত ইংরেজ লেখক উইনস্টন স্মিথ মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ "মুসলমান সমাজের একজন তেজস্বী মহান আধ্যাত্মিক সাধকের সমাধিগাত্রে হিন্দু সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের প্রতীক লক্ষ্য করে আমি বিস্মিত হয়েছি। গোটা সমাধি সৌধটিতেই হিন্দু ভাবধারার অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট।" (Akbar the Great Mughal, P. P. 442-443)

এমনিভাবে Henell-এর মন্তব্যও লক্ষণীয়। তিনি বলেন ঃ "ফতেহপুরের মসজিদটিকে মসজিদ অপেক্ষা বৈষ্ণব মন্দির বলে মনে হয়।" (A Hand Book of Indian Art, p 65)।

এক শ্রেণীর আলিমের ভূমিকা

আকবরের এই পথভ্রষ্টতার জন্য তৎকালীন সরকারের এক শ্রেণীর তল্পিবাহক আলিম এবং পীরও কম দায়ী নন। তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, কলহ, হিংসা-দ্বেষ, বিরুদ্ধতা এবং দীন ইসলামের মূল দাবীর ব্যাপারে

www.amarboi.org

জ্ঞানের স্বল্পতা বা অজ্ঞতা আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করেছে। ক্ষমতাসীনদের প্রতি তাদের দুর্বলতা, কাপুরুষতা এবং দীনের ব্যাপারে তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণেই তারা ৯৮৭ হিজরী সনে আকবরকে 'যিল্লুল্লাহ্' (আল্লাহর ছায়া বা রহমত), 'ন্যায়পরায়ণ নেতা' 'যুগ ইমাম' 'তিনি সকল আনুগত্যের উর্ধে' 'তাঁর হুকুমই সকলের উপর প্রযোজ্য' প্রভৃতি আল্লাহর গুণে অভিহিত করে ফতোয়া জারি করতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেননি। তাঁর প্রতি সম্মানসূচক সিজদা করারও ফতোয়া তাঁরা দিয়েছিলেন। মরহুম মওলানা আবুল কালাম আযাদ এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ "আকবরের শাসনামলে মখদুমুল মুলক ও আবদুন্ নবীর মতো ওলামায়ে ছূ'-অসৎ আলিমরা[১] উক্ত ফতোয়ায় দস্তখত করে নিজেদেরকে যে কঠোর শাস্তির যোগ্য করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ কি ধরনের ব্যবহার করবেন সেটা তিনিই ভালো জানেন। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঐ সকল আলিম এহেন নিন্দনীয় কাজের মাধ্যমে যে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে, তার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সত্য কথা বলতে কি, বিভিন্ন যুগে ইসলামের ওপর যত আঘাত এসেছে এহেন 'ওলামায়ে ছূ'-এর কারণেই এসেছে। আমি বলবো যে, আকবরের এই গোমরাহী সৃষ্টির জন্য সব চাইতে যারা বেশী দায়ী তারা আবুল ফজল ও ফয়েজী নয় বরং এসব 'দুনিয়ার কুকুর'রাই অধিক দায়ী। দুর্ভাগ্য, ঐ সময় এই স্বার্থপর ব্যক্তিরাই আলিমের আবরণ পরে রেখেছিল।"

যা হোক, আকবর কর্তৃক সৃষ্ট এই ঘোর তমসার বুকে পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ্ তায়ালা মুজাদ্দিদে আলফেসানীর ন্যায় এক প্রচন্ড সূর্যের উদয় ঘটান এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে তাঁর দুর্বার আন্দোলন, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও প্রতিরক্ষামূলক বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে তার অবসান ঘটে। কিন্তু আলফেসানী (রহ) এই গোমরাহী ও তার সঙ্গে সঙ্গে বিদআত-শিরকের অপরাপর বেগবান স্রোতের গতি প্রশমিত করতে সক্ষম হলেও উক্ত দুষ্ট ক্ষতের দাগ সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। তার কিছু কিছু জীবাণু পরবর্তী পর্যায়েও অবশিষ্ট ছিল। কেননা, দেখা

১ ইসলামী ইতিহাসে বিভিন্ন যুগের বিকৃত ঈমান ও বিকৃত আমলের আলিমদেরকে 'ওলামায়ে ছূ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দটি বর্তমানে একটি পরিভাষা হিসেবে প্রচলিত। -তাযকিরা, পৃষ্ঠা ঃ ২১।

www.amarboi.org

গেছে, আকবরের 'দীনে ইলাহী'র অনুসারীর সংখ্যা নিতান্ত কম হলেও এর সাধারণ প্রভাব ব্যাপকভাবে সংক্রমিত ছিল। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন, মুসলিম লেখকগণ যেখানে সাধারণত নিজ নিজ লেখা বিশেষ করে গ্রন্থাবলী 'হাম্‌দ' ও 'নাত' দ্বারা শুরু করতেন, সে ক্ষেত্রে বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন সরকারী লোক ও শাহী দরবারের মুসলমান লেখকগণ নিজেদের হিন্দু সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থাদির সূচনা করতেন 'গণেশ' বা 'স্বরসতী' প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীর নামে। এ ছাড়া 'দীনে ইলাহীর ধারণা ও প্রভাব আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের আমলেই কেবল নয় তার প্রপৌত্রের আমলেও যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ হচ্ছে দারাশিকো। শাহজাহানের পুত্র দারাশিকো প্রথম দিকে সুফী ভাবধারায় প্রভাবান্বিত থাকলেও পরবর্তী সময়ে তিনি ক্রমশ হিন্দু ধর্মমতের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় বহু হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুদিত হয়। হিন্দু সর্বেশ্বরবাদের পরিভাষার সাথে স্বমতের পরিভাষা সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি নিবন্ধ রচনা করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর এই চিন্তাধারা লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে অনেক নিষ্ঠাবান সুফীদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়ে পড়ে। দারাশিকো এভাবে সুফীদের দ্বারা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে সাধারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন (Islam the Straight Path)। সম্রাট আওরঙ্গজেব (১০৬৮-১১১৮ হিজরী) ও দারাশিকোর বিরোধ এবং পরিণামে দারাশিকোর পরাজয় ও নিহত হবার পেছনে মূলত এ কারণই কার্যকর ছিল। উভয়ের বিরোধকে দুই ভাইয়ের রাজক্ষমতা দখলের ঝগড়া মনে করা কিছুতেই ঠিক হবে না। বরং এ বিরোধ ছিল দুটি চিন্তাধারার এবং দুটি আদর্শের। আবুল মুযাফফর মুহিউদ্দিন আলমগীর আওরঙ্গজেব চেয়েছিলেন উপমহাদেশে মহানবীর আদর্শ তথা ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং দারাশিকো চেয়েছিলেন এখানে প্রপিতামহ আকবরের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে। কারো কারো মতে দারাশিকো ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হলে মোগল সাম্রাজ্য আজো টিকে থাকতো এবং টিকে না থাকলেও উপমহাদেশ থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।

www.amarboi.org

এসব কারণেই আওরঙ্গজেবের মতো ইসলামী আদর্শের পূর্ণ অনুসারী একজন মুসলিম শাসকের যুগ অতিক্রান্ত হবার পরও দেখা গেছে যে, পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত শাসকের অযোগ্যতায় সেই হিন্দুয়ানী ভাবধারা এবং এরই সঙ্গে শিয়া মতবাদ ও নানাবিধ অনৈসলামিক ভাবধারাপুষ্ট ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মুজাদ্দিদে আলফেসানী (৯৭১–১০৩৪ হিজরী) ও পরবর্তীকালে সাধক সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রচেষ্টায় যেসব অনৈসলামী রীতিনীতি ও ভাবধারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, উক্ত শাসকের দুর্বলতার সুযোগে সেগুলো পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এ ছিল পাক–ভারতের সাধারণ অবস্থা। তার পাশাপাশি সমাজের শিক্ষার অঙ্গন এবং সুধীমহল তথা ওলামা ও পীর–মাশায়েখদের কার্যকলাপ ছিল আরও অধঃপতিত। এক ধরনের সুফী ও ফকীর দরবেশ নামধারী ব্যক্তি ফকীরী মারেফতীর ছদ্মাবরণে সাধারণ মানুষের ধন–সম্পদ লুট করে যেতো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তখনো এরিস্টটলের প্রচারিত মতবাদের পচা লাশের ওপর অস্ত্রোপচার চলছিল। মাদ্রাসাগুলোতে 'শামসে বাজেগা' ও 'কাযী মুবারক' বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পঠিত হলেও কুরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে চিন্তা গবেষণার প্রতি কারুরই ভ্রুক্ষেপ ছিল না। মূলত 'উলুমে ইলাহিয়া'র মধ্যে তাঁরা এতই নিমগ্ন থাকতেন যে, 'কালামে ইলাহী'র প্রতি ভ্রুক্ষেপ করার সময়ই তাদের হাতে থাকতো না। তৎকালীন সাধারণ শিক্ষা তথা দরসে নিজামী[১] থেকে যদি কোন বিষয় পাঠ্যের বহির্ভূত থেকে থাকে তো তা ছিল কুরআন মজীদ। 'বড় বড় আলিমদের শিক্ষাচক্রেও একমাত্র মিশকাত শরীফ ও 'মাশারেকুল–আনওয়ার' পড়ানোকেই যথেষ্ট মনে করা হতো। অবস্থা এই ছিল যে, মুজাদ্দিদ (র) ও তাঁর সমকালীন শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ)–এর (৯৫৮–১০৫২ হিজরী) চিন্তাধারা থেকে যারা অধিক বঞ্চিত ছিল তারা হলো তদানীন্তন মাদ্রাসার পরিবেশের আলিমগণ। মুফতিগণের অবস্থা ছিল এই যে, তাঁরা 'মুতায়াখ্খিরীন' অর্থাৎ ৫ম হিজরীর পরবর্তী ফকীহ্ মুজতাহিদদের ফতোয়াকেই চূড়ান্ত বলে মনে করতেন। ইবনে নাজীম (৯৭০ হিজরী) এবং মোল্লা আলী ক্বারীর (১০১৪ হিঃ) কোন ফিক্হী

১. বর্তমান সময়ের প্রচলিত কওমী মাদ্রাসার শিক্ষানীতি।

www.amarboi.org

মতের বিরুদ্ধাচরণ করা অসম্ভব ছিল। কেউ এ ব্যাপারে ঔদ্ধত্য (?) দেখাতে গেলে হয়তো তাকে ওহাবী নতুবা মুবতাদি (বিদআতী) কিংবা লা-মাযহাবী ও অন্যান্য ধর্মীয় তিরস্কারবাণে জর্জরিত হতে হতো।

ওলামা ও শিক্ষাব্রতীদের এ অবস্থার পাশাপাশি সাধারণ মুসলমান ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা আরও নৈরাশ্যজনক ছিল। জনৈক অমুসলিম লেখকের মতে "সাধারণভাবে উপমহাদেশে ইসলাম তার প্রাণসত্তা হারিয়ে ফেলেছিল। কেবল ইসলামের আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি ও কল্পনা প্রসূত অলৌকিকতার প্রতি আসক্তিই প্রধান ছিল। যদি হযরত মুহাম্মাদ (সা) দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় আগমন করতেন, তাহলে তিনি তাঁর এসব অনুসারীদের মধ্যে ধর্মবিমুখতা ও প্রতিমা পূজা দেখে অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।"[১]

ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (রহ)

পাক-ভারতের মুসলমানদের এই বিশেষ অবস্থা এবং সাধারণভাবে মুসলিম বিশ্বের দীনি চিন্তার এই বন্ধ্যাত্বের মুহূর্তে একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। এক আলোর দিশারীর-যিনি তত্ত্ব ও দর্শনগত দিক থেকে মুসলিম মিল্লাতের সামনে কুরআন ও সুন্নাহর অনুশাসনগুলোর সঠিক তাৎপর্য স্পষ্টরূপে তুলে ধরবেন। যার চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী পুনর্জাগরণের পথ উন্মুক্ত হয়ে উঠবে এবং মুসলিম মিল্লাত ইসলামকে শুধু মসজিদ-মাদ্রাসা ও খানকার চার দেয়ালের অন্তর্ভুক্ত তথাকথিত ধর্মই মনে করবেনা; বরং একে একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান রূপে মেনে নিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র তারই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম করে যাবে, ইসলামের মধ্যে তারা খোঁজ করবে নিজেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক,

১. স্টুয়ার্ড তাঁর গ্রন্থ অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে মুসলিম দুনিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক চিত্র তুলে ধরেছেন। আমীর শাকীব আরসালানের মতে স্টুয়ার্ডই একমাত্র লেখক যিনি মুসলিম দুনিয়ার চিত্র এমন বিজ্ঞতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা কোন বিচক্ষণ মুসলিম লেখকের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। 'সীরাতে সাইয়েদ আহমদ' পৃষ্ঠা ৫০-৫১তে স্টুয়ার্ডের পূর্ণ উদ্ধৃতিটি রয়েছে।

www.amarboi.org

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যাবলীর সমাধান। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে ঠিক ঐ সময়ই এ মহান দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার জন্য দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত আল্লাহ্ভীরু পরিবারে এক শিশুর জন্ম হয়। উত্তরকালে ইনিই মুসলিম মিল্লাতের বিশেষ করে পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে ইসলামী চিন্তার দিক থেকে মুসলিম পুনর্জাগরণের অগ্রদূত হিসাবে সারা দুনিয়ায় ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তাঁর পিতার নাম হচ্ছে শাহ্ আবদুর রহীম (রহ)। ইসলামী জ্ঞান-গবেষণার জন্য আবদুর রহীম পরিবার পূর্ব থেকেই দিল্লীতে অধিক মশহুর ছিল। এ পরিবারে বহু খ্যাতনামা আলিম রয়েছেন। বংশ পরিচয়ের দিক থেকে ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (র)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর পিতামহ শাহ ওয়াজীহুদ্দীন (র) অত্যন্ত সাহসী পুরুষ ছিলেন। তিনি সম্রাট আলমগীরের শাসনামলে কয়েকটি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। মারাঠাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধেও তিনি মোগল সেনাবাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহর পিতা শাহ আবদুর রহীম সম্রাট আলমগীরের শাসনামলেই ইসলামী জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে বিভিন্নমুখী জ্ঞানের সমাবেশ ছিল। তিনি আধ্যাত্মিক বিষয় ও ধর্মীয় তথ্য-জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও আল্লাহ্ভীরু। সম্রাট আলমগীর যখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী আইনশাস্ত্র ফতওয়ায়ে আলমগীরী সংকলনের উদ্দেশ্যে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ আলিমদের উচ্চ পরিষদ গঠন করেন, তখন তাতে তাঁর নামও ছিল। কিন্তু স্বভাবগত ভাবে তিনি রাজদরবারে চাকরির প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেও বরাবর তিনি এ ব্যাপারে পরিষদকে সাহায্য করে যান।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ সম্রাট আলমগীরের ইনতিকালের চার বছর পূর্বে ১১১৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ এবং ১১৭৬ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। এদিক থেকে তিনি আলমগীরসহ মোট দশজন মোগল সম্রাটের যুগ প্রত্যক্ষ করেন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ (১) আলমগীর (আওরঙ্গজেব), (২) বাহাদুর শাহ (৩) মুয়েযযুদ্দীন

www.amarboi.org

জাঁহাদার শাহ, (৪) ফররুখ শিয়ার, (৫) রফিউদ্দারাজাত, (৬) রফিউদ্দৌলা, (৭) মুহাম্মাদ শাহ রঙ্গিলা, (৮) আবু নসর আহমদ শাঁহ, (৯) দ্বিতীয় আলমগীর, (১০) সম্রাট শাহ আলম।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ বাল্য বয়স থেকেই অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। তিনি সাত বছর বয়সের সময় কুরআন মজীদ কণ্ঠস্থ করেন এবং পনর বছর শেষ হবার আগেই যোগ্য পিতার তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বস্তুত এ কারণে ১১৩১ হিজরীতে যখন শাহ আবদুর রহীমের ইনেতিকাল হয়, তখন সতর বছর বয়সেই তিনি পিতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান বিতরণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ একাদিক্রমে বার বছর পর্যন্ত দিল্লীর রহিমীয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজে লিপ্ত ছিলেন। এ সময় ইসলামী জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট উৎকর্ষতা সাধিত হয়। কিন্তু মুসলিম সমাজের চিন্তাগত, নৈতিক ও রাজনৈতিক অধপতিত সাক্ষাৎ-অসাক্ষাৎ অবস্থা তাঁকে এ সময়ে বসে থাকতে দিল না, বিশেষ করে তৎকালীন ভারতের ধর্মীয়, রাজনেতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সমূহের গতিধারা লক্ষ্য করে তিনি গভীর ভাবে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন। কেননা, সম্রাট আলমগীরের জীবদ্দশাতেই ভারতে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ভয়াবহ দু'টি আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একটি দক্ষিণ ভারত থেকে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা আন্দোলন, অপরটি শিখ আন্দোলন। এছাড়া অন্যান্য বিষয় তো আছেই। ভারতে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল মারাঠা আন্দোলনের লক্ষ্য। শিখদের যাবতীয় ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চলতো পাঞ্জাবকে কেন্দ্র করেই। প্রথম দিক থেকে এটি ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন হলেও পরে গুরু গোবিন্দের নেতৃত্বে রাজনৈতিক রূপ লাভ করে।

মুসলমানদের সঙ্গে তাদের দুশমনির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে গিয়ে সিয়ারুল মুতায়াখিরীন গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেন যে, তাঁরা যেখানেই মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করতো সেখানেই তাদের বিষয় সম্পত্তিই কেবল লুটতরাজ করে নিয়ে যেতো না, বরং মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলতো। এমনকি

www.amarboi.org

তাদের হাত থেকে শিশু-সন্তান পর্যন্ত রক্ষা পেতো না। গর্ভবতী রমণীদের পেট চিরে সন্তান বের করে মা বাপের সামনেই তাদের হত্যা করতো। (সি, মু, ৪২ পৃঃ)। জনৈক হিন্দু লেখক বলেনঃ মুসলমানদেরকে শিখেরা নিজেদের চরম শত্রু মনে করতো। নিজেদের প্রভাবিত এলাকায় মুসলমানদেরকে আযান দিতে দিত না। মসজিদগুলোকে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থপীঠ ও উপাসনালয়ে পরিনত করতো এবং মসজিদের নাম বদলিয়ে একে 'মস্তগড়' বলে অভিহিত করতো। তারা মুসলমানদের ব্যবহৃত পাত্রকে অপবিত্র মনে করতো। প্রয়োজনবোধে তাতে পায়ের জুতো দিয়ে পাঁচটি আঘাত করার পর উক্ত পাত্র ব্যবহার করতো।

মারাঠা আন্দোলনের হোতা শিবাজী মারাঠাদেরকে উদয়পুরের রাণাদের বংশোদ্ভুত বলে পরিচয় দিত বলে এ আন্দোলন সহজেই অভিজাত হিন্দু এবং ব্রাহ্মণদের সহযোগিতা লাভ করে। পরবর্তী পর্যায়ে সারা ভারতে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। মারাঠা দস্যুদের হাতে মুসলমানদের জান-মালের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা ইতিহাস খ্যাত। 'খাযানায়ে আমেরা' ও 'তাবাতা বায়ী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, মারাঠা কর্তৃক দিল্লীতে লুটতরাজ এবং মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি যেরূপ অবমাননাকর আচরণ করা হয়, তা যে কোন মুসলমানের জন্য বেদনার উদ্রেক করে।

মক্কায় গমন

এসব আন্দোলন শাহ সাহেবের মনে গভীর রেখাপাত করে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ তাঁর খোদাদাদ চিন্তাশক্তি দ্বারা উপলব্ধি করলেন যে, বর্তমান মুসলিম সমাজকে বহুমুখী সমস্যার রাহুগ্রাস থেকে রক্ষা করতে হলে শুধু মাদ্রাসায় বসে গতানুগতিক শিক্ষাদান করলেই চলবে না বা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কিছু বক্তৃতাও এ জাতির মধ্যে জাগরণ আনয়নে সক্ষম হবে না। তিনি চিন্তিত মনে এ জন্য সঠিক পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র সাহায্যপ্রার্থী হন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি বার বৎসরের অধ্যাপনার কাজে বিরতি দিয়ে ২৯ বছর বয়সে ১১৪৩ কিংবা ১১৪৪ হিজরীতে পবিত্র মক্কা-মদীনা

www.amarboi.org

সফরে গমন করেন। উল্লেখ্য যে, পবিত্র মক্কা গমনও ঐ সময় সহজ ব্যাপার ছিল না। ঠিক ঐ সময়ই পর্তুগীজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতি কেউ শাসকের ভূমিকায়, কেউ বণিকের বেশে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে মুসলিম জাহানের দিকে এগিয়ে আসছিল। শাহ ওয়ালিউল্লাহ ১১৪৩-১১৪৫ হিজরী পর্যন্ত সফরে ছিলেন (অন্যমতে ১১৪৪-১১৪৬ হিজরী)। তন্মধ্যে মক্কা-মদীনায় চৌদ্দ মাস ও বাকী সময় যাতায়াতে অতিবাহিত হয়েছে। এতে তিনি দুই বার হজ্ব করার সুযোগ পেয়েছেন। পবিত্র হারামাইন শরীফাইনের সান্নিধ্যে গিয়ে ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের জন্য কান্নাকাটির মাধ্যমে এ জাতির মুক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তিনি কিরূপ প্রজ্ঞাশক্তি অর্জন করেছিলেন পরবর্তী ইতিহাস তার প্রমাণ। উক্ত জ্ঞানের মাধ্যমেই তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যাবার সন্ধান পেয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি যে আধ্যাত্মিক শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন, 'ফয়ুযুল হারামাইন' নামক তাঁর উচ্চাঙ্গের গ্রন্থটি পাঠে তা সহজেই অনুমেয়। তিনি উক্ত গ্রন্থের ৮৯-৯০ পৃষ্ঠায় ১১৪৪ হিজরীর ২০শে যিলকদের জুমা রাত্রির একটি দীর্ঘ স্বপ্নের বর্ণনা দান প্রসঙ্গে তাঁর প্রতি আল্লাহ্র একটি নির্দেশের কথা উল্লেখ করেছেন। নিছক বৈষয়িক ও জড়বাদী দৃষ্টিকোন থেকে প্রতিটি বিষয়কে যারা বিচার করে তাদের নিকট ঐ বিষয়টি ভিন্নরূপ ঠেকলেও যেহেতু শাহ সাহেব নিজেই তার বর্ণনাকারী তাই এটা ব্যক্ত না করার কার্পণ্য দেখানো কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। স্বপ্নের এক পর্যায়ে বলা হয়েছে,-তিনি নিজেকে এক বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে দেখতে পান। তাতে আরব-অনারব প্রায় সকল মুসলিম দেশের লোকই রয়েছে। প্রত্যেকেই মুসলমানদের ওপর ক্রমবর্ধমান বিজাতীয় প্রভাবে ক্রোধে ফেটে পড়ছে। সকলে তাঁর দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করছে যে, এ মুহূর্তে আল্লাহ্র কি নির্দেশ? তাঁর মুখ দিয়ে তখন বের হচ্ছে-'ফুক্কা কুল্লা নিজাম'-সকল (বাতিল) ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দাও।' অর্থাৎ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন সাধন করে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত শাহ সাহেব পরবর্তীকালে তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি ও লেখনীর আঘাতে তাই করেছিলেন।

www.amarboi.org

ঠিক অনুরূপভাবে তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থের মুখবন্ধে একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন-বৃত্তান্তের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, "আমি একদা আসরের নামাযান্তে আল্লাহ্র ধ্যানে নিমগ্ন রয়েছি। হঠাৎ অনুভব করি যে, প্রিয় নবীর পবিত্র আত্মা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মনে হচ্ছিল যে, আমার ওপর কোন চাদর রাখা হয়েছে। ঐ অবস্থায় আমার অন্তরে একথা ঢেলে দেওয়া হয় যে, 'দীনের ব্যাখ্যার ব্যাপারে এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করো।' তার পরক্ষণেই আমি আমার অন্তরে এমন এক (জ্ঞানের) জ্যোতি অনুভব করতে থাকি যা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হতে থাকে।"

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও গবেষণাকার্যে আত্মনিয়োগ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ ১১৪৬ হিজরীতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ইনতিকাল পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর যাবত শুধু গ্রন্থ রচনার কাজে নিমগ্ন ছিলেন। মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে তিনি যে পরিকল্পনা নিয়ে ভারত-ভূমিতে পা রাখেন, তাঁর মন-মস্তিষ্ককে যে ভাবধারা অস্থির করে তুলেছিল, সে অবস্থার মধ্যে বহু বছরের পুরুষানুক্রমিক শিক্ষাদান রীতির রুচিই তাঁর থেকে বিদায় নেয়। শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করার কোন অবকাশই তাঁর আর রইল না। তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ্ আবদুল আযীযের ভাষায়-"শ্রদ্ধেয় পিতা সকল বিষয়ের জন্য এক এক জন শিক্ষক তৈরী করে গিয়েছিলেন, যে বিষয়ের যে ছাত্র তিনি ঐ বিষয়ের শিক্ষকের নিকট যেতেন। তাঁর কাজ ছিল শুধু তথ্য জ্ঞান দান, লেখা ও হাদীস বর্ণনা।" তিনি ঐ সময়ের মধ্যে আরবী, ফারসী ভাষায় ন্যূনাধিক পঞ্চাশখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলো অধিকাংশই ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা, দর্শন ও তথ্যের দিক থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মানব জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইসলামের এমন কোন দিক নেই যেদিকে তিনি কলম ধরেননি। তাঁর গবেষণার সবচাইতে বিস্ময়কর দিক হচ্ছে এই যে, তিনি দু'শো বছর আগের পরিবেশে বসেও বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগে লালিত-পালিত ব্যক্তির ন্যায় সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে ইসলামী জীবনবিধানের ব্যাখ্যাদান করে গেছেন। ফররুখ সিয়ার, মুহাম্মাদ শাহ রঙ্গীলা

www.amarboi.org

ও শাহ আলমের শাসনকালীন ভারতের অশান্ত পরিবেশ সম্পর্কে ইতিহাস পাঠক মাত্রই পরিচিত। শাহ সাহেবই এমন একজন গবেষক যিনি চতুর্দিকের বিলাসিতা, ইন্দ্রিয় পূজা, হত্যা, লুটতরাজ, জুলুম নির্যাতন, অশান্তি ও বিশৃংখলার অবাধ রাজত্বের মধ্যে বসে একজন মুক্ত বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ভাষ্যকাররূপে যুগপরিবেশের সকল বন্ধন ও প্রভাবমুক্ত হয়ে প্রতিটি সমস্যার ওপর গভীর অনুসন্ধানী ও মুজতাহিদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। শাহ সাহেব যেভাবে তাঁর গ্রন্থাবলীতে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভঙ্গিতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য জ্ঞান পরিবেশন করেছেন, তার আলোকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের মূলনীতি এবং ইসলামী অনুশাসনসমূহের দার্শনিক দিক সহজেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তিনি যে ব্যাপারেই লেখনী ধারণ করেছেন, মনে হয় তৎসংক্রান্ত সকল বিষয়ের আলোচনাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর আরবী কিংবা ফারসী উভয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীই ভাবের গভীরতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা, প্রমাণ-পদ্ধতির দার্শনিক রীতি ও আবেদনশীলতার দিক থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বস্তুত তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এমন যুক্তিগ্রাহ্যভাবে ঢেলে সাজাতে প্রয়াসী ছিলেন যার মাধ্যমে অনাগত বংশধরদের নিকট ইসলামী বিধিব্যবস্থার মূল রহস্য, তথ্য ও দার্শনিক দিক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এরই ভিত্তিতে মুসলিম জাহানে, বিশেষ করে উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণ ও ইসলামী রাজনীতির অভ্যুদয় ঘটে। এদিক থেকে চিন্তা করলে অনেকের যে কোনো বৈপ্লবিক ভাবধারাপুষ্ট লেখার চাইতে তাঁর লেখনীকে অধিক বিপ্লবাত্মক বলতে হবে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ্র চিন্তাধারা ইসলামের স্বপক্ষে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। তাঁর উপস্থাপিত ইসলামী সমাজব্যবস্থায় রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নের যাবতীয় উপকরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ রয়েছে। এগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, যে কোন রাষ্ট্রে তা কার্যকরী করার উপযোগী। শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ (রহ) যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, যে কোন দেশ, যে কোন জাতির জন্য ইসলামই একটি শাশ্বত জীবন-বিধান।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ইতিহাসের ঐ সকল মহামনীষী মহাত্মাদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা যুগে যুগে মতবাদের বিভ্রান্তিজাল ছিন্ন করে চিন্তা ও গবেষণার

www.amarboi.org

একটি পরিচ্ছন্ন সরল রাজপথ তৈরী করেন এবং মানস জগতে সমকালীন পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অস্থিরতা সৃষ্টি করে নতুন সৃষ্টির এমন এক হৃদয়গ্রাহী চিত্র তৈরী করেন, যার ফলে অনিবার্যরূপে অন্যায় ও অসুন্দরের ধ্বংস সাধন এবং ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে একটি আন্দোলন জন্মলাভ করে। এ ধরনের চিন্তানায়কের পক্ষে নিজের চিন্তা ও মতাদর্শ অনুযায়ী একটি আন্দোলন গড়ে তোলা খুব কমই সম্ভব হয় কিংবা বিকৃত পৃথিবীকে ভেঙ্গেচুরে স্বহস্তে একটি নতুন পৃথিবী তৈরীর জন্য ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার অবকাশও থাকে তাদের কম। এহেন চিন্তানায়কদের আসল কাজ হয়, তাঁরা সমালোচনার ছুরি চালিয়ে শত শত বছরের বিভ্রান্তির জাল ছিন্ন-ভিন্ন করে বুদ্ধি ও চিন্তাজগতে নতুন দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করেন। জীবনের বিকৃত অথচ শক্তিশালী কাঠামোকে ভেঙ্গে তার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী সত্যকে আলাদা করে দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দেখা যায়, তাঁর 'তাফহীমাতে ইলাহিয়া' গ্রন্থের ১০১ পৃষ্ঠায় তিনি এ অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন যে, 'ঐ যুগে যুদ্ধ করে মানুষের সংশোধন সম্ভব হলে এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ লাভ করতে পারলে এ ব্যক্তিও (শাহ ওয়ালিউল্লাহ্) রীতিমতো যুদ্ধ ক্ষেত্রের অগ্রভাগে থেকে যুদ্ধ করত।' কিন্তু চিন্তার পুনর্গঠনের ব্যাপারেই তাঁর সকল সময় ব্যয়িত হয়েছে। এ বিরাট কাজ থেকে তিনি এতটুকুও অবসর পাননি। তিনি যে পথের সন্ধান দিয়ে গিয়েছিলেন, তার ভিত্তিতে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাবার জন্য অন্য একদল লোকের প্রয়োজন ছিল এবং মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তারা স্বয়ং শাহ ওয়ালিউল্লাহ্র শিক্ষা ও অনুশীলনাগারের মধ্য থেকে শক্তি ও পরিপুষ্টি লাভ করে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন।

ওয়ালিউল্লাহর কর্মী দল

এখানে সেই দল ও ব্যক্তিদের আলোচনা ও তাদের কর্মতৎপরতা সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক। এ আলোচনার মধ্য দিয়ে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আজকে এদেশে বা উপমহাদেশের অন্যান্য অংশে পরিচালিত ইসলামী

www.amarboi.org

আন্দোলনের সেতুবন্ধন হিসাবে তাঁরাই প্রধান ভূমিকা পালন করে গেছেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা দিল্লী শাসক সম্রাট শাহ্ আলমকে লালকেল্লা, এলাহাবাদ ও গাজীপুরের জায়গীর ছেড়ে দিলেও এগুলোর উপর থেকে তাঁর কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে উপমহাদেশে মুসলিম শাসন ক্ষমতার শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত মুছে দেবার পূর্বেই ইংরেজরা সমগ্র ভারতে নিরংকুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। সারা উপমহাদেশে আলিম ও গায়ের আলিম সুধী সমাজের মধ্যে এমন কারও প্রকাশ্যে এ ঘোষণা করার সাহস ছিল না যে, বিদেশীর শাসনাধীন ভারত হচ্ছে 'দারুল হরব' যেখানে জিহাদ করা প্রতিটি খাঁটি মুসলমানের কর্তব্য। সর্বত্র নৈরাশ্যের ছায়া ঘনীভূত হয়ে এসেছিল। সকল শ্রেণীর মুসলমান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। ইংরেজগণ উপমহাদেশে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে দৃঢ়তর করার জন্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা, ধ্যান-ধারণা, কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রসার দান ও এদেশের ঐতিহ্যবাহী শাসক জাতি মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্যমুখী করে গড়ে তোলার জন্য গভীর পরিকল্পনায় নিয়োজিত ছিল। মুসলমানদের ঐ সময়টি এক কঠিন পরীক্ষা।

ইংরেজ বিরোধী বিপ্লবী ফতওয়া

ঠিক ঐ সময় শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ আন্দোলনের প্রধান এবং ওয়ালিউল্লাহ্র তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আবদুল আযীয দেহ্লভী এক বিপ্লবী ফতওয়া প্রচার করে এই হতোদ্যম জাতিকে পথের সন্ধান দেন এবং তাদেরকে ইসলামের জিহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবার আহবান জানান। শাহ আবদুল আযীয তাঁর পিতা মহামনীষী ও ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্নদ্রষ্টা হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভীর তিরোধানের পর (১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ) থেকে দিল্লীর রহিমিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ওয়ালিউল্লাহ্র চিন্তাধারার প্রচার, জনসংগঠন প্রভৃতির মাধ্যমে 'তারগীবে মোহাম্মাদী' নামে ইসলামী পুনর্জগারণ আন্দোলনে নিয়োজিত ছিলেন। এই নির্ভীক মুজাহিদ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

"এখানে অবাধে খৃষ্টান অফিসারদের শাসন চলছে আর তাদের শাসন চলার অর্থই হলো তারা দেশরক্ষা, জননিয়ন্ত্রণবিধি, রাজস্ব, খেরাজ, ট্যাক্স,

www.amarboi.org

উশর, ব্যবসায়পণ্য, দন্ডবিধি, মোকদ্দমার বিচার, অপরাধমূলক সাজা প্রভৃতিতে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। এ সকল ব্যাপারে ভারতীয়দের কোনই অধিকার নেই। অবশ্য জুমার নামায, ঈদের নামায, আযান, গরু জবাই এসব ক্ষেত্রে ইসলামের কতিপয় বিধানে তারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে না। কিন্তু এগুলোতো হচ্ছে শাখা-প্রশাখা যেসব বিষয়ে উল্লেখিত বিষয়সমূহের এবং স্বাধীনতার মূল (যেমন মানবীয় মৌলিক অধিকার, বাক স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার) তার প্রত্যেকটিই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং পদদলিত করা হয়েছে। মসজিদসমূহ ধ্বংস করা হচ্ছে, কি হিন্দু কি মুসলমান পাসপোর্ট পারমিট ব্যতীত কারও শহরে আগমন-নির্গমনের সুযোগ নেই। সাধারণ প্রবাসী ও ব্যবসায়ীদেরকে শহরে আসা-যাওয়ার অনুমতি দানও দেশের স্বার্থে কিংবা নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে না দিয়ে নিজেদের স্বার্থে দেওয়া হচ্ছে।-অবশ্য হায়দ্রাবাদ, লাক্ষ্ণৌ ও রামপুরের শাসনকর্তাগণ ইংরেজদের আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়ায় সরাসরি খৃষ্টান সরকারের আইন সেখানে চালু হয় নাই। কিন্তু এতেও গোটা দেশের উপরে দারুল হরবেরই হুকুম বর্তাবে।"

[ফতওয়া- এ-আযীযী (ফারসী), পৃষ্ঠা ১৭ মুজতবায়ী প্রেস।] এমনিভাবে তিনি অন্য একটি ফতওয়ার মধ্যেও অবিভক্ত ভারতকে 'দারুলহরব' বলে ঘোষণা করেছেন।

এই ফতওয়া যে সম্পূর্ন রাজনৈতিক বিষয় কেন্দ্রিক তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। যার সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, আইন রচনার যাবতীয় ক্ষমতা খৃষ্টানদের হাতে। তারা ধর্মীয় মূল্যবোধকে হরণ করেছে। কাজেই প্রতিটি দেশপ্রেমিকের কর্তব্য হলো বিদেশী ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে নানাভাবে সংগ্রাম করা এবং লক্ষ্য অর্জনের আগ পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখা।

ইংরেজ বিরোধী ফতওয়ার প্রভাব

সাধারণ মুসলমানগণ এ যাবত যেখানে ইংরেজদের প্রতাপের সামনে নিজেদেরকে অসহায় মনে করতেন এবং দ্বিধাদ্বন্দে লিপ্ত ছিলেন, এ ফতওয়া

www.amarboi.org

প্রকাশের পর মুসলমানরা কর্মনীতি নির্ধারণের পথ খুঁজে পেলেন। শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভীর আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কর্মী ও তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রবৃন্দের দ্বারা উপমহাদেশের সকল শ্রেণীর মুসলমানের নিকট এই বিপ্লবী ফতওয়ার বাণী প্রচারিত হয়। আর এমনিভাবে মুসলমানদের মনে ক্রমে ক্রমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদীভাব জাগ্রত হতে থাকে।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, তাঁরই শিষ্য সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর নেতৃত্বে এবং তাঁর জামাতা মওলানা আবদুল হাই ও ভ্রাতুষ্পুত্র মওলানা ইসমাইল (শহীদ)-এর সেনাপতিত্বে (আনু ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ) বিরাট মুজাহিদ বাহিনী গঠিত হয়। এই মুজাহিদ বাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী (শিখ ও পরে ইংরেজ)দের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। তাঁরা এ উদ্দেশ্যে পূর্ব ভারত কিংবা দক্ষিণ অথবা উত্তর ভারতের কোনো স্থানকে নিরাপদ মনে না করে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পেশোয়ার-কাশ্মীর এলাকায় নিজেদের কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের এ আন্দোলনে পূর্ব ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহ (কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, মোমেনশাহী, সিলেট প্রভৃতি জেলা) থেকেও মুসলমানরা যোগদান করেছিলেন। এই ইসলামী আন্দোলন শাহ্ আবদুল আযীযের উক্ত ফতওয়ার প্রভাবে বাংলাদেশেও বিপুল সাড়া জাগিয়েছিলো। যার ফলে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরের হাজী শরীয়ত উল্লাহর নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন নামে এক শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। প্রায় ঐ সময়ই মুজাহিদ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বাংলার মওলানা হাজী তিতুমীর (নেছার আলী) ও তাঁর সঙ্গীরা এখানে বহু স্থানে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। মওলানা হাজী তিতুমীর ছিলেন 'শহীদে বালাকোট' সাইয়েদ আহমদ শহীদের একনিষ্ঠ শিষ্য। তিনি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে (সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী যে সালে বালাকোটে শাহাদাত বরণ করেন ঐ সালেই বাংলাদেশে) ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে শহীদ হন। সাইয়েদ আহমদ শহীদের শিষ্য মওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রহ) বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আদর্শ প্রচারে বিরাট কাজ করেন। বাংলাদেশে মুসলমানদের জীবন থেকে হিন্দুয়ানী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব দূর করেন। এ

www.amarboi.org

অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে মওলানা কেরামত আলী জৈনপুরীর অসামান্য দান বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে চিরদিন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যা হোক, মুজাহিদ বাহিনীর নেতা সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী জিহাদের উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় ও অন্যান্য দেশের মুসলিম মনীষি ও ইসলামী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মক্কা শরীফে হজ্ব করতে যান। ১৮২৩ খৃঃ তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখান থেকে এসেই ইসলামী আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তাঁর দলের প্রতিটি মুজাহিদকে তিনি ইসলামের সোনালী যুগের কর্মীদের আদর্শে গঠন করতে চেষ্টা করেন। তাঁদের রাত্র দিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ভোরে প্রচার কার্য, দিবাভাগে কঠোর দৈহিক পরিশ্রম ও রাত্রিতে তাহাজ্জুদ ও অন্য ইবাদতে জাগরণ–এসব ছিল এই খোদাভক্তদের দৈনিক সাধারণ কর্মসূচী। অবিভক্ত ভারতের সর্বত্র জিহাদের প্রস্তুতি ও প্রচারণা শেষ করে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে রায়বেরিলী ত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গে সেই সময় মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল এক লাখ। তাঁরা গযনী, কাবুল ও পেশোয়ার হয়ে নওশেরায় হাজির হন। শিখরা ইংরেজদের সাথে গোপনে চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। তারা রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে আধিপত্য বিস্তার করে মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছিল। শিখরা শেরসিংহ ও জনৈক ফরাসী জেনারেলের অধীন প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে পন্জতারে মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে মুকাবিলা করে। এ যুদ্ধে শিখেরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এবং মুজাহিদ বাহিনী পেশোয়ার অধিকার করে–(১৮৩০ খৃষ্টাব্দ)। এভাবে বালাকোট যুদ্ধের আগ পর্যন্ত আরও বহু যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী শিখদের সঙ্গে জড়িত হন। শেষ পর্যায়ে মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিন লাখে। রণজিৎ সিংহের সুশিক্ষিত খালসা বাহিনীকে পরাজিত করার পর মুজাহিদরা পেশোয়ার অধিকার করে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। অধিকৃত এলাকায় মওলানা সাইয়েদ মাযহার আলীকে প্রধান বিচারপতি ও কাবুলের সুলতান মুহাম্মদকে প্রধান প্রশাসক নিয়োগ করেছিলেন। এ নবগঠিত ক্ষুদে ইসলামী রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে তিনি পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজ কবলিত সাবেক 'দারুল ইসলাম' ভারত পুনরুদ্ধারের জন্য আরও

www.amarboi.org

অধিক শক্তি সঞ্চয় করতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঠিক ঐ সময় পরাজিত রণজিৎ সিংহ ইংরেজদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে শঠতার আশ্রয় নেয়। অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে সীমান্তের পাঠান ও উপজাতীয়দেরকে তাঁর দলছাড়া করার চেষ্টা করে।

সাইয়েদ আহমদ কুসংস্কার বিরোধী ছিলেন। ফলে অনেক পাঠান ও উপজাতীয় লোক অর্থলোভে বা কুসংস্কারবশত অকপটে এ আন্দোলনকে গ্রহণ করতে পারেনি। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বালাকোট নামক স্থানে শিখদের সঙ্গে প্রচন্ড সংঘর্ষের সৃষ্টি হলে খুবি খাঁ নামক এক পাঠানের বিশ্বাসঘাতকতায় সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী ও মওলানা ইসমাইল দেহলভী শাহাদত বরণ করেন। তারপরও এই ইসলামী আন্দোলনের বীর সেনানীরা দমেননি। সীমান্তের ইয়াগিস্তানের সিত্তানায় সাইয়েদ সাহেবের বিশ্বস্ত খলীফাদের নেতৃত্বে সমবেত হন। সাইয়েদ সাহেব শাহাদাতের পূর্বে বালাকোটের রণাঙ্গন থেকে তাঁরই বিশিষ্ট খলীফা মওলানা বেলায়েত আলী আজীমাবাদীকে ভারতের অভ্যন্তরে কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন। এ ঘটনার পর মওলানা বেলায়েত আলী তাঁর ভ্রাতা মওলানা এনায়েত আলী ও অপর বিশিষ্ট নেতা মওলানা মুহাম্মদ আলী বহু কষ্টে সাংগঠনিক শক্তিকে মজবুত করে ইয়াগিস্তান থেকে শিখ প্রধান গোলাব সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধ সাড়ে চার বছরকাল স্থায়ী থাকে। অতপর ইংরেজ সরকার সরাসরি এতে হস্তক্ষেপ করে অনেক মুজাহিদকে গ্রেফতার করে–কাউকে শহীদ করে, কারুর প্রতি চলে অমানুষিক নির্যাতন। অবশ্য ভারত সীমান্তের বাইরে থেকে মুজাহিদদের এক দল সব সময়ই সংগ্রাম চালিয়ে যায়। বালাকোটের সাময়িক ব্যর্থতা, নেতৃবৃন্দের শাহাদত ও পরবর্তী পর্যায়ে মুজাহিদ বাহিনীর উপর ইংরেজদের অকথ্য নির্যাতন সত্ত্বেও এই সংগ্রামী বাহিনীর কর্মীরা নিশ্চুপ বসে থাকেননি। তাঁরা বিভিন্নভাবে উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ প্রচার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টি করে গেছেন। শাহ আবদুল আযীয কর্তৃক প্রচারিত সেই দারুল হরবের ফতওয়া এবং পরবর্তী পর্যায়ে তারই ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর অনুসারিগণ কর্তৃক স্বল্পকাল স্থায়ী ইসলামী রাষ্ট্র গঠন ও বালাকোটের লড়াই এবং তারপরও বিভিন্ন তৎপরতার

www.amarboi.org

মাধ্যমে ইংরেজ বিরোধীভাব জাগ্রত করা–এসব কিছুই ঐতিহাসিক ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পটভূমি রচনা করেছে–যার সূচনা করেছিলেন শুকরের চর্বি মিশ্রিত বন্দুকের টোটা ব্যবহার ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বেরাকপুরের মুসলিম সৈন্যগণ। এই বিপ্লবকে ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেলও মূলত সেটাই ছিল উপ–মহাদেশের প্রথম বলিষ্ঠ ও ব্যাপক আযাদী আন্দোলন এবং অবিভক্ত ভারত থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার ব্যাপারে প্রচণ্ড আঘাত।

আধুনিক অস্ত্র, পারস্পরিক ঐক্যের অভাব ইত্যাদি কারণে এ বিপ্লব ব্যর্থ হয়। এ বিপ্লবের নায়ক ছিলেন ওয়ালিউল্লাহ্ আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ সংগ্রামী আলিমরাই। নানা কৌশলগত কারণে নেতৃত্বদানকারী অনেক আলিমের নাম সেই সময় উহ্য ছিল বিধায় অনেক ঐতিহাসিকের লেখাতে তাঁদের কেউ কেউ বাদ পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তিনি বালাকোট মুজাহিদ বাহিনীর অন্যতম নেতা হিসেবে ১৮৫৭ সালের ইসলামী বিপ্লবে পরোক্ষভাবে প্রধান নেতার আসনে সমাসীন ছিলেন। ভারতের অভ্যন্তরে ঐ সময়কার এ ইসলামী বিপ্লবের গতিধারা তাঁর দ্বারাই অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হতো। ওয়ালিউল্লাহ্ আন্দোলনের কর্মীদের এ দান আমাদের দেশের কোনো কোনো লেখক অজ্ঞতা বশত কিংবা ইর্ষাপরায়ণতার কারণে উপেক্ষা করলেও অনেক হিন্দু লেখক এবং বিখ্যাত ইংরেজ লেখক হান্টারও অস্বীকার করতে পারেননি। ১৮৫৭ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর উপমহাদেশের মুসলিম জীবনে সবচেয়ে ঘোর দুর্দিন নেমে আসে। হিন্দুরা ইতিপূর্বেই ইংরেজদের সহযোগিতায় লেগে গিয়েছিল। ইংরেজদের আশংকা ছিল–একমাত্র যাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল সেই মুসলমানদের পক্ষ থেকেই। তাই মুসলমানদের রাজনেতিক জীবনের ন্যায় তাদের শিক্ষা, সাংস্কৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনও সংকীর্ণ ও দুর্বিসহ হয়ে উঠে–যাবতীয় অধিকার থেকে হয় বঞ্চিত। ইংরেজরা বিপ্লবের জন্য একমাত্র মুসলমানগণকেই দায়ী করে তাদেরই উপর জুলুম–নির্যাতনের স্টীমরোলার চালাতে থাকে। বিপ্লবের নায়ক ও কর্মী শত শত আলিম ও হাজার হাজার সাধারণ মুসলমানগণ এ জন্য ইংরেজদের রোষানলে পড়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেন,

www.amarboi.org

কেউ মাল্টা বা আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত হন, কেউ দীর্ঘকাল যাবত কারা অন্তরালের আঁধার কক্ষে তিলে তিলে ক্ষয় হন। এক তথ্যে দেখা যায়, বিপ্লবের পরে একস্থানে ২৮ হাজার মুসলমানকে ফাঁসি দেয়া হয় এবং শত শত আলিম শাহাদত বরণ করেন। এহেন পরিস্থিতিতেও বালাকোট আন্দোলনের মুজাহিদ ও তাঁদের ভাবশিষ্যরা সংগ্রামের পথ ছেড়ে দেননি। তাঁরা একদিকে সীমান্তের ইয়াগিস্তানে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন, অপরদিকে শাহ ওয়ালিউল্লাহর সুযোগ্য বংশধর সাইয়েদ সাহেবের মন্ত্রশিষ্য মওলানা শাহ ইসহাক সাহেবের নেতৃত্বে ভারতের অভ্যন্তরে ইংরেজদের চক্ষু এড়িয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জিহাদের অনুকূলে সতর্কতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যান। মুক্তিযোদ্ধারা স্থানে স্থানে মাদ্রাসা কায়েম এবং ধর্মীয় সভা-সমিতির মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি মূল্যবোধের প্রচার, জিহাদী প্রচারণা ও জাগরণকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। বস্তুত সে প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার ফলশ্রুতি হিসাবেই আমরা দারুল উলুম দেওবন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখতে পাই। এগুলোকে কেন্দ্র করে পরবর্তী পর্যায়ে আরও অসংখ্য শিক্ষা ও জিহাদী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং উপমহাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণের পথ উন্মুক্ত হয়। উত্তরকালে "অসহযোগ আন্দোলন" ও "খিলাফত আন্দোলন"কে উপলক্ষ করে মুসলমানদের মধ্যে আযাদী আন্দোলনের যে সাড়া জাগে এবং ১৯৪৭ ইং সালে ইসলামের নামে আমরা যে পাকিস্তান অর্জন করি এর প্রত্যেকটি ঐ সকল কাজেরই অনিবার্য ফল বৈ কিছু নয়। পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামী খিলাফত ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্পে অবিভক্ত পাকিস্তানে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে বিভিন্নভাবে যে প্রচন্ড আন্দোলন চলে, সেটাকেও শাহ ওয়ালিউল্লাহ্র প্রদর্শিত ইসলামী রেনেসাঁরই অংশ এবং বালাকোট ও ১৮৫৭ সালের মুজাহিদদেরই ভাবশিষ্যদের দ্বারা পরিচালিত বলতে হবে। মোটকথা, শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভীর চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আযীয দেহলভী, সাইয়েদ আহমদ শহীদ, মওলানা ইসমাইল শহীদ দেহলভী ও মওলানা আবদুল হাই প্রমুখ ইসলামী আন্দোলনের অগণিত বীর সিপাহী যে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন, উপমহাদেশের সমকালীন প্রতিটি ইসলামী আন্দোলন ও কর্মতৎপরতা তারই পরিশিষ্ট।

www.amarboi.org

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ)-এর কাজ ও চিন্তাধারা।

পবিত্র মক্কায় অবস্থানকালে পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম-অমুসলিম রাষ্ট্রের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উত্থান-পতনের খবরাখবরের আলোকে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের সাহায্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহর নিকট এ বিষয়টি প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল যে, জীবনাদর্শের অন্তর্নিহিত শক্তি ছাড়া কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই কোন জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। অন্যথায় বহুশত বছর যাবত দোর্দন্ড প্রতাপে শাসনদন্ড পরিচালনা করার পরও মুসলিম মিল্লাতের এ দুরবস্থা কেন? তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, একমাত্র ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারাই মুসলমানরা দুনিয়ার দিকে দিকে বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে সমর্থ হয়েছে। কাজেই মুসলিম জাতির উপযোগী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা পেশ করার সাথে সাথে ইসলামী শক্তিবাদের একটি যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাও মানুষের সামনে পেশ করা একান্ত প্রয়োজন। ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শসমূহকে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করে সেই আদর্শে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে পারলেই মুসলমানগণ তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে ফিরে পাবে-লাভ করবে তারা আদর্শ জীবন, আর এভাবেই জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে সমর্থ হবে। রাজতান্ত্রিক পরিবেশের প্রতিকূলতার মধ্যে সৃষ্ট বিশেষ এক রকম সুফী ভাবধারার ক্রমবিকাশের ফলে মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামের যে অসম্পূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছিল, তার কারণে অধিকাংশের মধ্যেই এ ধারণা বদ্ধমূল হতে চলেছিল যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপার তথা রাজনীতি ও ধর্ম আলাদা জিনিস, ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের আনুষ্ঠানিক কতিপয় বিধি-বিধান পালিত হলেই মানুষ পরকালে মুক্তি পাবে, আর রাজনীতি দুনিয়াদারির ব্যাপার, এটা দুনিয়াদারদের জন্যই শোভা পায়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি কঠোর আঘাত হেনেছেন। তাঁর মতে মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জীবনের উন্নতি সাধনই নবুওতের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, আমরা কুরআন মজীদে দেখতে পাই, যখন কোন জাতির নৈতিক অবনতি ঘটেছে তখনই তাদের মধ্যে নবী-রসূলের আগমন হয়েছে আর তাদের নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থা অনুসারে

www.amarboi.org

চলার ফলে জাতির নৈতিক উন্নতির সাথে সাথে আর্থিক তথা জাগতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। তার মতে, দীনের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রীয় উন্নতিতে কোনো তফাত নেই। জাতীয় উন্নতি বলতে নৈতিক এবং পার্থিব উন্নতি দু'ই বুঝতে হবে। মুসলমান জাতির ক্রমোন্নতির ইতিহাসই তার সাক্ষ্য। এ জন্যই পবিত্র কুরআনের ভাষায় মুসলমানদের এ বলে মুনাজাত করতে বলা হয়েছে যে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করো।'

যা হোক, মানব জীবনের সার্বিক উন্নতিকল্পে ইসলামকে জীবনের পরিপূর্ণ একটি বিজয়ী ও শক্তিশালী আদর্শ হিসাবে তুলে ধরার জন্য খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের এ শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক দার্শনিক হজ্ব থেকে ফিরে আসার পর নতুন পরিকল্পনা মাফিক ইসলাম সম্পর্কে যেসব অমর গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, তন্মধ্যে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। (১) সমালোচনা ও সংশোধনমূলক বিষয়, (২) গঠনমূলক বিষয় (৩) এসবের আলোকে গণসংগঠন। তবে যেহেতু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তৃতীয় বিষয়টির প্রতি হাত দেয়ার সময় তাঁর হয়ে উঠেনি, কিন্তু তাঁর রচনায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। তাই তাঁর কাজ ও চিন্তাধারার প্রথম দু'টি বিষয় নিয়েই এখানে আলোচনার প্রয়াস পাব।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ (রহ) মক্কা থেকে আগমনের পর নতুন পরিকল্পনা মাফিক যেসব সংস্কারমূলক কাজ করেন প্রধানত ঐগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করা চলে (১) সমালোচনা ও সংশোধনমূলক এবং (২) গঠনমূলক। বিশেষজ্ঞদের মতে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ই প্রথম ব্যক্তি, যাঁর দৃষ্টি ইসলামের ইতিহাস ও মুসলমানের ইতিহাস–এর সূক্ষ্ম ও মৌল পার্থক্য পর্যন্ত পৌঁছেছে, যিনি ইসলামী ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মুসলিম ইতিহাসের সমালোচনা ও পর্যালোচনা করেন এবং যিনি এ কথা অবগত হবার চেষ্টা করেন যে, বিভিন্ন শতকে ইসলাম গ্রহণকারী জাতিদের মধ্যে আসলে ইসলামের কি অবস্থা ছিল। এটা অত্যন্ত জটিল বিষয়বস্তু। অতীতেও এ ব্যাপারে কিছু লোক বিভ্রান্তির শিকার হন এবং আজও হচ্ছেন। এ ব্যাপারে 'ইযালাতুল খিফা'[১] গ্রন্থের ষষ্ঠ

১. ১২৮৬ হিজরীতে বেরিলী থেকে প্রকাশিত সংস্করণ

www.amarboi.org

অধ্যায়ের ১২২ পৃষ্ঠা থেকে ১৫৮ পৃষ্ঠায় তিনি ধারাবাহিক ভাবে মুসলিম ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে প্রত্যেক যুগের বিশেষত্ব এবং প্রত্যেক যুগে উদ্ভূত ফিতনার বিবরণ দান প্রসঙ্গে এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবহ মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ উদ্ধৃত করেন। তাতে তিনি মোটামুটিভাবে মুসলমানদের আকীদা, বিশ্বাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও রাজনীতি সংমিশ্রিত সকল প্রকার জাহিলিয়াতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। অতপর যাবতীয় ত্রুটির মধ্য থেকে যেগুলো মৌলিক এবং সকল ত্রুটির উৎস, এমন দু'টির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। এক, নবুওত পদ্ধতির খিলাফত থেকে রাজতন্ত্রের দিকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের গতি পরিবর্তন। দুই, ইজতেহাদের প্রাণ শক্তির মৃত্যু ও মন মস্তিষ্কের উপর অন্ধ অনুসারিতার আধিপত্য। প্রথমটির ব্যাপারে তিনি বর্ণিত কিতাবে রাজতন্ত্রের নীতিগত ও পারিভাষিক পার্থক্যকে এমন সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেন এবং হাদীসের সাহায্যে তার এমন যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, তাঁর পূর্বেকার লেখকদের রচনায় তার দৃষ্টান্ত বিরল। এমনিভাবে ইসলামী বিপ্লবের ফলাফলকে তিনি যেরূপ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন, পূর্ববর্তীদের রচনায় তেমনটি দেখা যায় না। এক স্থানে তিনি লেখেন ঃ "ইসলামের মূল স্তম্ভগুলো প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে বিরাট ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। হযরত উসমান (রা)–এর পর কোনো শাসক হজ্ব কায়েম করেননি। বরং নিজের প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন। অথচ হজ্ব কায়েম করা ইসলামে অপরিহার্য বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সিংহাসনে আরোহণ করা, রাজমুকুট পরিধান করা এবং অতীত রাজা–বাদশাহদের আসনে বসা যেমন কায়সার ও কিসরার জন্য রাজত্বের প্রতীকরূপে পরিগণিত হতো, তদ্রূপ নিজের কর্তৃত্বে হজ্ব প্রতিষ্ঠা করা ইসলামে খিলাফতের প্রতীক হিসেবে পরিচিত।" –(ইযালাতুল খিফা–১ম খন্ড, ১২৩–১২৪ পৃষ্ঠা)।

অতপর তিনি 'ইযালা' গ্রন্থের ১৫৭ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ "এদের সরকার অগ্নিপূজকদের সরকারের ন্যায়। শুধু পার্থক্য এ জায়গায় যে, এরা নামায পড়ে এবং মুখে কলেমায়ে শাহাদত উচ্চারণ করে। এ পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের জন্ম। জানি না, পরবর্তীকালে আল্লাহ্ আরও বা কতকিছু দেখান। এ ব্যাপারে

www.amarboi.org

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' 'বদুরে বাজেগাহ' 'তাফহীমাত' 'মুসাফ্ফা' ও তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে আলোচনা রয়েছে।

দ্বিতীয় ত্রুটি অর্থাৎ কোনো ব্যাপারে নিরপেক্ষ ও মুক্ত চিন্তা নিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক অনুশাসন বা তার অনুকূলে বিধানের খোঁজ না নিয়ে অন্ধভাবে অপরের অনুসরণ করা। এ ব্যাপারে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (রহ) আলোচ্য গ্রন্থের ১৫৭ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

"সিরীয় শাসকদের (উমাইয়া সরকার) পতনকাল পর্যন্ত কেউ নিজেকে হানাফী বা শাফেয়ী বলে দাবী করতো না। বরং সবাই নিজেদের ইমাম ও শিক্ষকগণের পদ্ধতিতে শরীয়তের প্রমাণ সংগ্রহ করতেন। ইরাকী শাসকদের (আব্বাসীয়) আমলে প্রত্যেকেই নিজের জন্য আলাদা নাম নির্দিষ্ট করে নেয়। তাদের অবস্থা এ পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, নিজ নিজ মাযহাবের নেতাদের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে তারা কোন কিছুর সিদ্ধান্ত করতো না। এভাবে কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যার ব্যাপারে অনিবার্যরূপে যেসব মতবৈষম্যের উদ্ভব হয়েছিল, সেগুলো স্থায়ী বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অতপর আরব শাসকদের পর যখন তুর্কী শাসনামলে মানুষ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তখন প্রত্যেকেই ফিকাহ্ ভিত্তিক মাযহাব থেকে যা কিছু স্মরণ করতে সক্ষম হয় ঐ টুকুকেই নিজেদের আসল দীনে পরিণত করে। পূর্বে যে সকল বস্তু কুরআন ও হাদীসের সূত্র উদ্ভূত মাযহাব ছিল, এখন তা স্থায়ী সুন্নাহ্তে পরিণত হয়েছে।"

তিনি 'মুসাফ্ফা' গ্রন্থের ১ম খন্ডের ১১ পৃষ্ঠায় লেখেন ঃ "আমাদের যুগের সরল লোকেরা ইজতিহাদ থেকে বিমুখ। এদের নাকে উটের মতো রশি লাগানো। বেচারারা, কোন্ দিকে যাচ্ছে কোনই খবর নেই। তাদের ব্যাপারই আলাদা। ঐসব ব্যাপার বুঝার যোগ্যই নয়।"

শুধু অন্ধানুসরণ না করে স্বাধীন ও মুক্ত বিচারবুদ্ধি নিয়ে কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে সমস্যার সমাধান খোঁজ করা সম্পর্কে "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা"র সপ্তম অধ্যায়ে ও "আল-ইনসাফ" গ্রন্থে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অন্ধানুসরণের এ ব্যাধির পূর্ণ ইতিহাস তাতে বিবৃত হয়েছে এবং এর

www.amarboi.org

দ্বারা সৃষ্ট যাবতীয় ত্রুটির প্রতি তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, যা পরে বিবৃত হচ্ছে।

সমসাময়িক পরিস্থিতির পর্যালোচনা

সমালোচনার উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয়ের উদ্ধৃতির পর সংক্ষেপে তাঁর সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কিত সমালোচনামূলক কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হচ্ছে ঃ

১. সুফীবাদের একটি ত্রুটির সমালোচনা

"অনুভূতির পূজা ঃ সুফীদের জনপ্রিয়তা ও তাদের ভক্তদলে শামিল হবার কারণে এর উদ্ভব হয়েছে। মাশরিক ও মাগরিবের সমগ্র এলাকায় এ জিনিসটি ছেয়ে আছে। এমনকি সুফীদের কথা ও কর্ম সাধারণ মানুষের মনের উপর কুরআন ও সুন্নাহ তথা সবকিছুর চাইতে অধিক আধিপত্যশালী। তাদের তত্ত্বকথা ও ইঙ্গিতসমূহ এত বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে, কেউ এগুলোকে অস্বীকার কিংবা এর প্রতি আমল না দিলে সে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে না এবং 'নেককার' ও মুত্তাকীদের মধ্যে গণ্য হয় না। মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, সুফীদের ইশারা-ইঙ্গিত সম্বলিত বক্তৃতা করে না। মাদ্রাসায় অধ্যাপনারত এমন কোন আলিমও নেই, যে তাদের কথায় বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ না করে। অন্যথায় তারা নির্বোধ বিবেচিত হয়।"

২. অযোগ্য পীর ও পীরজাদাদের কঠোর সমালোচনা

"কোন যোগ্যতা ছাড়াই যেসব পীরজাদা বাপ-দাদার গদীনশীন হয়েছে, তাদেরকে আমি বলিঃ "তোমরা কেন এসব পৃথক পৃথক দল গঠন করে রেখেছো? তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের পথে (তরীকা) চলেছো কেন? আল্লাহ্তায়ালা মুহাম্মদ (সা)কে যে পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন সেটি পরিত্যাগ

www.amarboi.org

করেছো কেন? তোমাদের প্রত্যেকে এক একজন ইমামে পরিণত হয়েছে। মানুষকে নিজেদের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। নিজেদেরকেই হিদায়াতদানকারী ও হিদায়াতকারী মনে করছে অথচ নিজেই মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে। পার্থিব স্বার্থের গরজে যারা মানুষকে 'বয়'আত' করায় তাদের প্রতি আমরা বিন্দুমাত্রও সন্তুষ্ট নই। আর যারা দুনিয়ার স্বার্থে ইল্‌ম হাসিল করে অথবা মানুষকে নিজেদের দিকে আহ্বান করে, তাদের দ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে, তাদের প্রতিও আমরা সন্তুষ্ট নই। তারা সবাই দস্যু, দাজ্জাল, মিথ্যুক, প্রবঞ্চক ও প্রবঞ্চিত।" (তাফহীমাত)।

বস্তুত এ কারণেই কেউ বলে যে, তাসাউফের বিরুদ্ধে ভারতে সর্বপ্রথম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ই বিদ্রোহের বাণী উচ্চারণ করেছেন। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তার বিপরীত। আসলে তিনি ইসলামের খাঁটি তাসাউফ যাকে কুরআনের ভাষায় 'তাযকিয়ায়ে নাফ্‌স' বলা হয়েছে তাকে বহিরাগত আবর্জনা মুক্ত করেছেন এবং ইসলামের দৃষ্টিতে যা নির্ভেজাল তাসাউফ তিনি তাই পেশ করেছেন। বলা বাহুল্য, শাহ ওয়ালিউল্লাহ যদি তথাকথিত তাসাউফের এরূপ সমালোচনা ও তার সঠিক রূপরেখা তুলে না ধরতেন, তাহলে পাশ্চাত্য লেখকরা যেভাবে একে "বিভিন্ন দেশ ও ধর্ম এমনকি ভারতীয় যোগীদের ভাবধারা থেকে ধার করা" পর্যন্ত বলে হালকা করার প্রয়াস পাচ্ছিল, তার ফলে আজ তার অস্তিত্ব থাকতো কিনা সন্দেহ।

৩. শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটির প্রতি নির্দেশ

"নিজেদেরকে ওলামা (শিক্ষিত) আখ্যাদানকারী জ্ঞানার্জনকারীদের বলি ঃ "নির্বোধের দল, তোমরা গ্রীকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানতিক-বালাগত তথা ন্যায়শাস্ত্র ও অলংকার শাস্ত্রের গোলক ধাঁধাঁয় আটকে পড়েছো। আর ধরে নিয়েছো যে, জ্ঞান কেবল এগুলোতেই আছে। অথচ সত্যিকার বিদ্যা আল্লাহ্র কিতাবের সুস্পষ্ট আয়াতে এবং তাঁর রসূলের মাধ্যমে প্রমাণিত সুন্নাতের মধ্যে নিহিত। তোমরা পূর্ববর্তী ফকীহগণের খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত বর্ণনাবলীতে ডুবে গিয়েছো। তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল যা বলেছেন সেটিই

www.amarboi.org

একমাত্র হুকুম। তোমাদের বেশিরভাগ লোকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, নবীর কোন হাদীস যখন তাদের নিকট পৌঁছে তখন তারা তার উপর আমল করে না।"

আলিম সমাজের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন ঃ "তোমরা আল্লাহ্র বান্দাদের জীবনের পরিধি সংকীর্ণ করে দিয়েছো। ইসলামের নমনীয়তাকে তোমরা উপেক্ষা করছো।"

৪. কুরআন—হাদীসের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ

ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ্র দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষার ব্যাপক প্রচারের উপরই জাতির উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এ জন্য তিনি এ দিকে বিশেষ মনোযোগ দান করেন এবং তদানীন্তন রাষ্ট্রভাষা ফার্সীতে কুরআন মজীদ ও 'মুয়াত্তা-ই-ইমাম মালিক'-এর তরজমা করেন। অবশ্য পরবর্তীকালে উর্দুর প্রচলন হলে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ্ আবদুল আযীয, শাহ্ রফিউদ্দিন এবং শাহ আবদুল কাদির উর্দু ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা ও তফসীর করেন।

কুরআন মজীদ অধ্যয়নের পর যাতে হাদীসের জ্ঞান লাভ করা যায় তিনি তদ্রূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। একমাত্র শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ এবং তাঁর পুত্র ও তাঁদের শাগরিদদের প্রচেষ্টায়ই উপমহাদেশে 'ইলমে হাদীসের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

মিসরের প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ আল্লামা রশীদ রেযা এ সম্পর্কে বলেন ঃ "মিসর, সিরিয়া, ইরাক, হিজায প্রভৃতি দেশে হিজরী দশম শতক থেকেই 'ইলমে হাদীসে'র প্রচার হ্রাস পেতে থাকে। অথচ আমাদের ভারতীয় ভাইগণ বহু পরিশ্রমে উক্ত ইলেমকে জিন্দা রেখেছেন।"

৫. ইমাম সাহেবের প্রতি রক্ষণশীল ধর্ম ব্যবসায়ীদের হামলা

সত্যের ধারকরা যুগে যুগেই স্বার্থপর কিংবা রক্ষণশীলদের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভীও এ থেকে রেহাই

www.amarboi.org

পাননি। এক শ্রেণীর মতলববাজ ধর্ম ব্যবসায়ী আলিম ও পীর ভবিষ্যতে নিজেদের স্বার্থ নষ্ট হবার আশংকায় ইমাম সাহেব কর্তৃক কুরআন তরজমা করণের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে সাধারণ মুসলমানদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। তারা চিরাচরিত কায়দায় তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজিতে লিপ্ত হয়। এমনকি, একবার তিনি ফতেহপুর মসজিদে অবস্থানকালে এই গোঁড়া প্রকৃতির ধর্মব্যবসায়ীরা দলবদ্ধভাবে তাঁর উপর সশস্ত্র হামলা চালায়। ঐ সময় তাঁর নিকট শুধু একটি কাঠের টুকরা ছিল। তিনি তা হাতে নিয়ে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করে সকলকে স্তব্ধ করে দেন এবং তাদের মধ্য দিয়েই নিরাপদে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হন।

৬. শাসকদের প্রতি

"—তোমরা আরাম আয়েশে লিপ্ত হয়ে সাধারণ গণমানুষকে পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হবার সুযোগ দিচ্ছো। প্রকাশ্যে শরাব পান চলছে অথচ তোমরা বাধা দিচ্ছো না। প্রকাশ্যে ব্যভিচার, জুয়া ও শরাবের আড্ডা চালু হচ্ছে অথচ তোমরা এগুলো বন্ধ করো না। এ বিরাট দেশে কাউকে শরীয়তের আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়নি। তোমরা যাকে দুর্বল মনে করো তাকে খেয়ে ফেলো, যাকে শক্তিশালী মনে করো, তাকে ছেড়ে দাও। নানা রকম খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ, স্ত্রীদের মান অভিমান এবং গৃহ-বস্ত্রের বিলাসিতার মধ্যেই তোমরা ডুবে গিয়েছো। একবার আল্লাহ্কে ভয় করো। তোমরা আমীর-ওমরাহ্রা নিজেদের কর্তব্য সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছো। যাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমাদের উপর ন্যস্ত ছিল, তোমরা সেই জনগণের অবস্থার প্রতি মোটেই দৃষ্টি দিচ্ছো না। দায়িত্বহীনতার ফলে (সমাজের) এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর উপর বেপরোয়া জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে।"

৭. জিহাদের জন্য আহ্বান ও তার মূল লক্ষ্যের প্রতি নির্দেশ

"বর্তমান অবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের পক্ষে শান্তি ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠাকল্পে আপোষহীন মনোবল নিয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী জিহাদে

www.amarboi.org

ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার। অত্যাচারীরা পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখা কর্তব্য। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সফল হবার পর তাদের কর্তব্য আরও বৃদ্ধি পাবে। মুসলিম শাসকগণ যখন তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হবেন এবং সাধ্য মতো সংগ্রাম করে দুনিয়ায় আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠা করবেন, তখনই দেশের দিকে দিকে দেখা দিবে প্রকৃত শান্তি। তার ফলেই আমাদের জীবন হবে আনন্দমুখর ও সাফল্যমন্ডিত।"

৮. সৈনিকদের উদ্দেশ্যে

"আল্লাহ্ তোমাদের জিহাদ করার জন্যে, সত্যের সুমহান বাণীকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে এবং শির্ক ও মুশরিকদের শক্তি খতম করার জন্য সৈনিকে পরিণত করেছেন। তোমরা ঐ কর্তব্যকে অবহেলা করে নিছক ঘোড়সওয়ারী ও অস্ত্রশজ্জা করাকেই নিজেদের পেশায় পরিণত করেছো। অর্থোপার্জন করার জন্যে তোমরা সেনাবাহিনীতে চাকরি নিয়েছো।"

৯. শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের নৈতিক অবস্থার সমালোচনা

"বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী তোমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রতিপালক থেকে গাফিল এবং এ সঙ্গে শির্কে লিপ্ত রয়েছো। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির অবস্থা কিছুটা স্বচ্ছল সে নিজের খানাপিনা ও পরিচ্ছদে বেশী খরচ করে। ব্যয় অনুপাতে আয়ের পরিমাণ কম হওয়ায় অপরের অধিকার নষ্ট করে।"

১০. আলিম সমাজের প্রতি

"তোমরা আল্লাহ্র বান্দাদের জীবনের পরিধি সংকীর্ণ করে দিয়েছো। তোমরা ব্যাপকতার জন্যে আদিষ্ট—সংকীর্ণতার জন্য নয়।"

এভাবে তিনি মুসলিম সমাজে প্রচলিত অনেক কুসংস্কার ও ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বহু রীতি-নীতিরও কঠোর সমালোচনা করেছেন। বিশেষ

www.amarboi.org

করে মনস্কামনা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে যারা পরলোকগত বুযুর্গের দরবারে গিয়ে তার নিকট কিছু চায়, তারা ব্যাভিচারের চাইতে বড় অপরাধে অপরাধী বলে উল্লেখ করেছেন। এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তিনি কত গভীরভাবে মুসলমানদের অতীত ও বর্তমানকে পর্যালোচনা করেছেন।

গঠনমূলক কাজ

গঠনমূলক কাজের মধ্যে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো, তিনি ফিকাহ্ তথা ইসলামী আইনশাস্ত্রে একটি যুক্তিপূর্ণ মধ্যপন্থা পেশ করেন। এতে সাধারণ রীতি অনুযায়ী একটি বিশেষ মতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও অন্য একটি মতের সমালোচনা করা হয়নি। একজন গভীর অনুসন্ধানকারীর ন্যায় তিনি সকল ফিকাহ্ ভিত্তিক মাযহাবের নীতি-পদ্ধতি অধ্যয়ন করেন এবং পূর্ণ স্বাধীনভাবে রায় প্রদান করেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মাযহাবী বিরোধের প্রবণতা হ্রাস এবং মাযহাব অনুসারীদের মধ্যে অনুসন্ধান ও ইজতিহাদের পথ উন্মুক্ত করেন। তিনি সকল মাযহাবের মধ্যে সমঝোতা, বিশেষ করে শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাবদ্বয়কে একটি মাযহাবের রূপ দিতে প্রয়াসী ছিলেন। 'তাফহীমাত' এবং 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' ও 'আল ইনসাফ'-এ এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। বস্তুত এই মধ্যপন্থা গ্রহণ করার ফলে বিদ্বেষ, সংকীর্ণতা, অন্ধ অনুসৃতি ও অনর্থক দীর্ঘ আলোচনায় সময় ক্ষেপণের অবসান ঘটে। আর এরই মাধ্যমে নানা মতের মুসলিমদের একটি গতিশীল জীবন্ত জাতি হিসেবে বিশ্বে দাঁড়ানো সম্ভব। এ জন্যেই শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ইজতিহাদের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ইজতিহাদ

'মুসাফফা' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন ঃ "ইজতিহাদ প্রতিযুগে 'ফরযে কিফায়া'। এখানে ইজতিহাদ অর্থ হলো শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানার্জন এবং সেগুলোর বিস্তারিত ও

www.amarboi.org

খুঁটিনাটি বিষয়ের ব্যাখ্যা অনুধাবন করে শরীয়তের আইন-কানূনকে যথাযথভাবে সংযোজন ও সংগঠন করা, তা কোন বিশেষ মাযহাব প্রণেতার অনুসারীও হতে পারে। আর ইজতিহাদ প্রতি যুগে 'ফরযে কিফায়া' হবার যে কথা বলছি, তা এ জন্যে যে, প্রতি যুগে অসংখ্য স্বতন্ত্র সমস্যার সৃষ্টি হয়। সেগুলো সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ জানা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। আর ইতিপূর্বে যেসব বিষয় লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হয়েছে। তা এ ব্যাপারে যথেষ্ট হয় না বরং তার মধ্যে নানান মতবিরোধও থাকে। শরীয়তের মৌল বিধানের প্রতি প্রত্যাবর্তন না করলে এ মত বিরোধ দূর করা সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারে মুজতাহিদগণ যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছিলেন, তাও মাঝপথে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। কাজেই এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ছাড়া গত্যন্তর নেই।" (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১)

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (রহ) ইজতিহাদের উপর কেবল জোরই দেননি, বরং বিস্তারিতভাবে ইজতিহাদের নিয়ম-রীতি, সংবিধান ও শর্তাবলীও বর্ণনা করেছেন। 'ইযালাতুল খিফা' 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা', 'ইকদুল জীদ', 'আল ইনসাফ', 'বদুরে বাযেগা', 'মুসাফফা' প্রভৃতি গ্রন্থে কোথাও তার নিছক ইঙ্গিত এবং কোথাও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। তার গ্রন্থ পাঠে মানুষ ইজতিহাদের কেবল রীতি নিয়মই শিখতে পারে না, এ বিষয়ে শিক্ষা লাভও করতে পারে।

উল্লেখিত কাজ দু'টি শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর পূর্ববর্তী লোকেরাও করেছেন। কিন্তু যে কাজ তাঁর পূর্বে আর কেউ করেননি তা হলো এই যে, তিনি ইসলামের সমগ্র চিন্তা, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শরীয়ত ব্যবস্থাকে লিপিবদ্ধ আকারে পেশ করার চেষ্টা করেছেন। এ কাজের ব্যাপারে তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের ছাড়িয়ে গেছেন। যদিও প্রথম তিন চার শতকে অনেক বেশী ইমামের আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁদের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাঁদের চিন্তারাজ্যে ইসলামের জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্র ছিল এবং অনুরূপভাবে পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও এমন অনেক অনুসন্ধানকারী গবেষকের সাক্ষাত পাওয়া যায়, যাঁদের সম্পর্কে ধারণা করা যায় না যে, তাঁদের চিন্তা রাজ্যও এ চিন্তা শূন্য ছিল। তবু তাঁদের একজনও সুনিয়ন্ত্রিত ও

www.amarboi.org

যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যবস্থাকে একটি জীবন ব্যবস্থা হিসাবে লিপিবদ্ধ করার দিকে দৃষ্টি দেননি।

তিনিই ইসলামী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যাঁকে ইসলামী দর্শন লিপিবদ্ধকরণের ভিত্তি স্থাপন করতে দেখা যায়। এর আগে মুসলমানদের দর্শন সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন ও লিখেছেন, লোকেরা তাকে ভ্রান্তিবশত 'ইসলামী দর্শন' নামে আখ্যায়িত করেছে। অথচ সেগুলো ছিল 'মুসলিম দর্শন'। ঐ সব দর্শনের বংশসূত্র গ্রীস, রোম, ইরান ও হিন্দুস্তানের সাথে সম্পর্কিত। যদিও শাহ্ সাহেবের পরিভাষার ক্ষেত্রে পুরাতন দর্শন, কালাম শাস্ত্র কিংবা সেখানকার বহু চিন্তা ও ধারণা লক্ষ্য করা যায়, তা শুরুতে নতুন পথ আবিষ্কারকদের জন্য স্বভাবতই অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহর সমাজ দর্শন

তিনি বিশ্ব জাহান ও এর মানুষ সম্পর্কে এমন এক দর্শন সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, যা ইসলামের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল ও তার সমভাবাপন্ন প্রকৃতির অধিকারী হতে পারে।

নৈতিক ব্যবস্থার উপর তিনি একটি সমাজ দর্শনের (Social Philosophy) ইমারত নির্মাণ করেন। 'ইরতিফাকাত' (মানুষের দৈনন্দিন কার্যাবলী) শিরোনামায় তিনি এর বর্ণনা দেন। এ প্রসঙ্গে পারিবারিক জীবন সংগঠন, সামাজিক রীতিনীতি, রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, কর-ব্যবস্থা (Taxation), দেশ শাসন, সামরিক সংগঠন প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। এ সঙ্গে সমাজ সভ্যতার বিপর্যয় ও বিকৃতি সৃষ্টির কারণসমূহের উপর আলোকপাত করেন। তারপর তিনি শরীয়ত, ইবাদত, আহকাম ও আইন কানূনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা পেশ করেন এবং প্রত্যেকটি জিনিসের গুঢ় তথ্য বুঝাতে থাকেন। ইমাম গায্যালীকেও তিনি এ ব্যাপারে ছাড়িয়ে গেছেন।

www.amarboi.org

শেষের দিকে তিনি বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ও আইন-কানুনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে এখানে শুধু তাঁর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হচ্ছে। একটি অর্থনৈতিক, অপরটি রাজনৈতিক।

অর্থনৈতিক চিন্তাধারা

ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর অর্থনৈতিক দর্শনের মূলকথা হলো দেশের সামগ্রিক সম্পদ যে জনগোষ্ঠীর যৌথ বা বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টায় উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাতে এমন সুষম বন্টন বা বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে সম্পদ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের হাতে পুঞ্জিভূত না হয়ে পড়ে। একচেটিয়া মালিকানা কিংবা দৈহিক বা মানসিক কোনরূপ শ্রমবিহীন মালিকানার তিনি বিরোধী। তাঁর মতে, নাগরিকত্বের প্রাণসত্তা হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতা, আর এই সহযোগিতা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে থাকে একের প্রতি অপরের কল্যাণকারিতার উপর, যা একমাত্র শ্রমের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, তিনি পুঁজি ও মানসিক প্রচেষ্টাকেও শ্রমের মধ্যে গণ্য করেন। অতএব তাঁর মতে, সমাজে কোন ব্যক্তি বিনাশ্রমে সম্পদ ভোগ করতে কিংবা অল্প শ্রমে অধিক সম্পদের অধিকারী হতে পারে না। কেননা, তাদের মধ্যে নারিকত্বের এই মূল শর্ত অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যদি তারা সম্পদের অধিকারী হয়, তা হলে সম্পদের যারা মূল উপার্জন শক্তি তথা কৃষক, শ্রমিক, পুঁজি ও মানসিক শ্রমদাতা, তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে। আর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে সমাজে একদিকে শোষিত ও বঞ্চিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, তাদের উপর নাগরিক দায়িত্বভার বেড়ে যাবে, তারা করভারে জর্জরিত হবে, অনাদায়ে নির্যাতন ও কঠোরতার সম্মুখীন হবে, অপরদিকে আর এক শ্রেণী কর্তৃক বিলাসিতা, বাহুল্য ও ইন্দ্রীয়পূজার বাজার গরম হয়ে উঠবে, যাতে কোন অবস্থায়ই জাতীয় সম্পদ তো বৃদ্ধি পাবে না, পরন্তু তা অনেকের পকেটশূন্য হয়ে এক স্থানে এসে কুক্ষিগত হবে।

www.amarboi.org

এক কথায়, তাঁর চিন্তাধারা অনুযায়ী চাষী-মজুর এবং অন্যভাবে শ্রমদাতা যেসব ব্যক্তি দেশ ও জাতির জন্য চিন্তামূলক কাজে নিয়োজিত, তারাই সম্পদের আসল অধিকারী (অবশ্য অক্ষম ও বিকলাঙ্গের কথা স্বতন্ত্র)। উপরিউক্ত ব্যক্তিদের উন্নতি ও সমৃদ্ধিই মূলত জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি। এ শক্তিসমূহকে দাবিয়ে রাখার জন্য যে কোন ব্যবস্থা (চাই সেটা রাজতন্ত্রমূলকই হোক কিংবা অন্য কোন প্রকারের) সচেষ্ট হয়ে উঠলে সেটা কোন দেশ ও জাতির জন্য অবশ্যই মারাত্মক। এহেন অশুভ শক্তিকে অবশ্যই খতম করা উচিত-(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা)। যে সমাজ ব্যবস্থা শ্রমের প্রকৃত মূল্য দেয় না তার অবসান হওয়া আবশ্যক-(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, সিয়াসাতুল মাদানীয়া অধ্যায়)। তাঁর মতে, অভাবী শ্রমিকের সম্মতিকে তার সন্তুষ্টি মনে করা চলে না, যে পর্যন্ত না তার ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায় করা হবে, যা পারস্পরিক সহযোগিতার মূল নীতির ভিত্তিতে অপরিহার্য বলে গণ্য-(হুজ্জাত)। শ্রমিকের কাজের সময়কাল নির্দিষ্ট থাকতে হবে। তাকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংশোধন এবং পরকালের ধ্যান ও চিন্তাভাবনার জন্য অবশ্যই অতিরিক্ত সুযোগ দিতে হবে। জনগণের উপর অধিক করের বোঝা চাপানো অন্যায়-(হুজ্জাত)। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার বা প্রভাব দেশের জন্য মারাত্মক-(হুজ্জাত)। কোন রাজকীয় জীবন ব্যবস্থার অধীনে-যেখানে বিশেষ গোষ্ঠী বা পরিবারের অমিতব্যয়িতা, বিলাসিতা, খামখেয়ালী ও ব্যয়-বাহুল্যের ফলে সমাজে সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, সে ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকের দুঃখ মোচনার্থে উক্ত ব্যবস্থার অবসান হওয়া একান্ত জরুরী-(হুজ্জাত)।

এ থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর নিকট রাজতন্ত্রের অপকারিতাসমূহ সুস্পষ্ট ছিল এবং ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থার মধ্যেই তিনি মানবতার মুক্তি লক্ষ্য করেছেন। প্রসঙ্গত এ কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আধুনিককালে যদিও এসব বিষয় অহরাত্র চর্চা হয়ে থাকে, কিন্তু তিনি যে যুগে বসে এ কথা বলে গেছেন, সে সময়কার পরিবেশ চিন্তা করলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়। কেননা, তখনও ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হতে অর্ধশতক

www.amarboi.org

বাকী। কম্যুনিজমের জনক কার্লমার্ক্স ও তাঁর সহযোগী এঙ্গেলস–এর জন্মেরও এক শতক পরে। তখন ইউরোপের যান্ত্রিকযুগের বয়স মাত্র চল্লিশ বছর। তাই এ কথা নিসন্দেহে বলা চলে যে, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর মতো চিন্তাবিদ ও দার্শনিকের যে যুগে আবির্ভাব ঘটে, সে সময় যদি উপমহাদেশে যান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটতো কিংবা তিনি কার্লমার্ক্স বা এঙ্গেলসের মতো কোন মুদ্রাযন্ত্রের দেশে জন্ম নিতেন–যেখান থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের মতবাদ ও চিন্তাধারাকে দূর–দূরান্তে ছড়িয়ে দেয়া যায়, তা হলে সম্ভবত সকলের পূর্বে তার সমাজদর্শন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদই বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করতো।

রাজনৈতিক চিন্তাধারা

এক. সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'য়ালা। এতে কোনরূপ অংশীদারিত্ব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ভূ–পৃষ্ঠে বিচরণকারী মানুষ হচ্ছে প্রবাসীর ন্যায়।

দুই. মানুষ হিসাবে প্রতিটি আদম সন্তানের সমান মর্যাদা। একের প্রতি অপরের প্রভুত্ব দাবী করার কোন অধিকার নেই–এক মানুষ আর এক মানুষের দাসত্ব করতে পারে না। কোন ব্যক্তি রাষ্ট্র বা জাতির মালিক হতে পারে না। কোন মানুষের পক্ষে ক্ষমতাশালী কোন শাসকের প্রতিও এরূপ ধারণা পোষণ করা অবৈধ।

তিন. রাষ্ট্র প্রধানের মর্যাদা 'মুতাওয়াল্লী'র সমতুল্য। মুতাওয়াল্লী প্রয়োজনবোধ করলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সে পরিমাণই অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন, যে পরিমাণ দ্বারা রাষ্ট্রের একজন সাধারণ নাগরিকের জীবন নির্বাহ হয়ে থাকে।

চার. রাষ্ট্রের সর্বস্তরে একমাত্র আল্লাহ্র দীনেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত।

www.amarboi.org

মৌলিক অধিকার

এ ব্যাপারে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা', 'আল বদুরুল বাযেগাহ্', প্রভৃতি গ্রন্থে 'ইরতিফাকাত'-জনকল্যাণ অধ্যায়ে যা বিশদরূপে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে ঃ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, বিবাহ, স্বাস্থ্য, সন্তান-সন্ততি, শিক্ষা-দীক্ষা লাভ প্রভৃতি জাতি-ধর্ম বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্মগত অধিকার। ঠিক অনুরূপভাবে উঁচু নীচু নির্বিশেষে ভেদ-বৈষম্যবিহীন রাষ্ট্রের সকল মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার করা, তাদের জানমাল ও ইজ্জত-আবরুর হিফাজত করা, প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও সমান নাগরিকত্বের অধিকার লাভ সকল জন্মগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকারও মৌলিক অধিকারসমূহের শামিল।

ইসলাম একটি বিপ্লবী দীন—একটি বিপ্লবী জীবন ব্যবস্থা

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ইসলামকে একটি বিপ্লবী জীবন বিধান বলেছেন। তাঁর মতে, ইসলাম যুক্তি ও শক্তিবাদের ধর্ম। বিশ্বমানবের মুক্তি ও কল্যাণের খাতিরে দুনিয়ার সকল মানুষকে একই আদর্শের পতাকা তলে সমবেত করার উদ্দেশ্যেই ইসলামের আবির্ভাব হয়। কুরআন মজীদের নির্দেশ অনুযায়ী যুক্তিবাদ ও সুষ্ঠু বুদ্ধিমত্তার পথেই মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান জানাতে হয়। শান্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ইসলামের মূল কথা। তবে ইসলামের আহ্বানে একান্তভাবে যুক্তিযুক্ত শান্তি প্রতিষ্ঠার খাতিরে হলেও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতা, মিথ্যা, অহেতুক আভিজাত্যবোধ ও স্বার্থপরতা ইসলামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হতে পারে। এ জন্য শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ) বিশ্বাস করতেন যে, বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য, এ সত্য ও শান্তির জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। যদি কখনও তদ্রূপ বিপ্লব দেখা দেয়, তবে তাকে সকল মানুষের সমর্থন করা উচিত মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের খাতিরেই। তাঁর মতে, বৃহত্তম কল্যাণের খাতিরে ছোটখাট ক্ষয়-ক্ষতির কথা চিন্তা করা কখনও যুক্তিসঙ্গত

www.amarboi.org

নয়। কুরআন মজীদে উক্ত হয়েছে যে, "আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশমূলক হুকুম ও সঠিক জীবন বিধান' দিয়ে একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছেন যে, এটাকে (সঠিক জীবন বিধানকে) অন্যান্য সকল (মানব রচিত) জীবন বিধান ও বিধি-ব্যবস্থার উপর জয়যুক্ত করতে হবে-যদিও তাতে মুশরিক অবাধ্য লোকেরা জ্বলে পুড়ে উঠবে।" এ আয়াতের মর্মানুযায়ী সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ইসলাম মানুষের পথ নির্দেশ সত্য জীবন-বিধান হওয়া সত্ত্বেও তাকে দুনিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি সুব্যবস্থার আবশ্যক। ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর মতে, এটা একমাত্র কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির অধীন একটি ত্যাগী, একনিষ্ঠ, সুসংবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ দলের মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। ভাড়াটিয়া বা পেশাদার কোন ফৌজ দ্বারা এরূপ কাজ সম্ভব নয়।

ওয়ালিউল্লাহ্ চিন্তাধারার ফসল

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা এহেন যুক্তিগ্রাহ্য ও সুসংগঠিত খসড়া পেশ হবার অর্থই হলো এই যে, তা সকল সুস্থ প্রকৃতি ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হবে, আর তাদের মধ্যে যারা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী তারা এ লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে আসবে। শাহ্ সাহেব জাহেলী রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেই ক্ষান্ত হননি, এ ব্যাপারটাকে বার বার এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে ঈমানদারদের পক্ষে জাহেলী রাষ্ট্র খতম করে সে স্থলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা না চালিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' ও 'ইযালাতুল খিফা'তে এ বিষয়টির উপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে তিনি হাদীসের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, ইসলামী খেলাফত ও রাজতন্ত্র দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস অতপর একদিকে রাজতন্ত্র এবং সে সব বিপর্যয়কে স্থাপন করেন, যেগুলো ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে রাজতন্ত্রের পথে মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে এবং অন্যদিকে ইসলামী খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলী এবং সে সব অবদান পেশ করেন, যা ইসলামী খিলাফত আমলে প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের মধ্যে অনুসৃত

www.amarboi.org

হয়। এরপরও মুসলমানদের পক্ষে নিশ্চিন্তে বসে থাকা কি করে সম্ভব হতে পারে? আর পারে না বলেই শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র ইন্তিকালের (১৭৮৬-১৮৩১) অর্ধশতক অতিক্রান্ত হবার আগেই ভরতবর্ষে সাইয়েদ আহমদ বেরেলবী ও ইসমাঈল শহীদ দেহলভীর নেতৃত্বে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের উদ্ভব হয়। তারা একটি অস্থায়ী ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেন। অবশ্য কতিপয় বৈষয়িক কারণে তা সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও তার প্রভাব উপমহাদেশে এখনও বিদ্যমান। অবিভক্ত পাকিস্তান আন্দোলনের পশ্চাতে সেই আন্দোলনের প্রভাব কাজ করেছে এবং বলতে কি এ অঞ্চলে খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন প্রকট, মূলত এটাও ওয়ালিউল্লাহ্র চিন্তাধারার ও বালাকোটে ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদদের চরম আত্মত্যাগেরই ফল। কেননা, বালাকোটের ব্যর্থতার পর যখন উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর বিজাতীয় কর্তৃত্ব প্রাধান্য লাভ করে, তখনও আলিম সমাজ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেননি, তাঁরা ঘোর তমসার মধ্যেও ইসলামের নিভৃ নিভৃ দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁরা পরিকল্পনার মাধ্যমে উপমহাদেশে জালের ন্যায় দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-মাদ্রাসা সমূহ কায়েম করে এগুলোর মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখেছেন। এ পরিকল্পনাধীন মাদ্রাসা সমূহের মধ্যে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দই ছিল প্রধান। আযাদী ও ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুম দেওবন্দ ও এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে উপমহাদেশের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যে ইসলামী জাগরণ মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয়, পরবর্তী পর্যায়ে খিলাফত আন্দোলনের মধ্যে তারই অভিব্যক্তি ঘটে। তাই উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণ ও পরবর্তীকালে পাকিস্তান আন্দোলন ও বর্তমানে এদেশসহ সারা মুসলিম দুনিয়ায় যে ইসলামের নবজাগরনের পূর্বাভাষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এটাকে নির্দ্বিধায় ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাধারা ও তাঁর বংশধর ও অনুসারীদের আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি বলতে হবে।

উল্লেখযোগ্য যে, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর আকাংখিত ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে প্রথম ইসলামী আন্দোলন (বালাকোট) এবং পরবর্তী

www.amarboi.org

পর্যায়ে সিপাহী বিপ্লব, বাংলাদেশে ফরায়েযী আন্দোলন, হাজী তিতুমীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র আন্দোলন প্রভৃতি সকল জাতীয় জাগরণের পটভূমি রচনায় যে মহাপ্রাণ ব্যক্তির মাধ্যমে শাহ সাহেবের চিন্তাধারা কাজ করেছিল তিনি ছিলেন তাঁরই সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ্ আবদুল আযীয (রহ) (১৭৪৭–১৮২৪ খৃষ্টাব্দ)। পিতার ইন্তিকালের পর সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উক্ত মহান লক্ষ্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি পিতৃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের[১] মাধ্যমে প্রথমে দীনী শিক্ষার ব্যাপক প্রচারের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। আজকের উপমহাদেশে অগণিত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত। শাহ্ আবদুল আযীযের মাধ্যমে অসংখ্য লোক বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তন্মধ্যে তাঁর চার ভ্রাতা, উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও ইসমাঈল শহীদ দেহলভীসহ কতিপয় প্রখ্যাত শিষ্যের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ (১) মওলানা শাহ্ রফীউদ্দিন, (২) মওলানা শাহ্ আবদুল কাদের, (৩) মওলানা শাহ্ আবদুল গনী, (৪) মওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক, (৫) শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াকুব, (৬) মওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল হাই, (৭) মওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাঈল, (৮) সাইয়েদ আহমদ শহীদ,(৯) মওলানা রশীদুদ্দীন, (১০) মওলানা মুফতী সদরুদ্দীন, (১১) মুফতী এলাহী বখশ, (১২) হযরত শাহ্ গোলাম আলী, (১৩) মওলানা মাখসুল্লাহ, (১৪) মওলানা করীমুল্লাহ্, (১৫) মওলানা মীর মাহবুব আলী, (১৬) মওলানা আবদুল খালেক, (১৭) মওলানা হাসান আলী লক্ষ্ণৌভী, (১৮) মওলানা হোসাইন আহমদ মলীহাবাদী প্রমুখ।

শাহ্ আবদুল আযীয (রহ)–এর শিক্ষাদানের বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল–

(১) ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাধারাকে মন–মস্তিষ্ক দিয়ে উপলব্ধি করা, (২) আল্লাহভীতি ও আদর্শ জীবন গঠনের প্রেরণা লাভ, (৩) রাজতন্ত্র ও

১. উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম সাহেব হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পুরাতন রহীমিয়া মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যার আধিক্য হেতু সম্রাট মুহাম্মদ শাহ্ কর্তৃক মাদ্রাসার জন্য যে বিশাল অট্টালিকাটি প্রদত্ত হয়েছিলো সেটি ১৮৫৭ সালের হাঙ্গামায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

www.amarboi.org

সরকার তোষণ মনোভাব মন-মস্তিষ্ক থেকে দূর করা, (৪) ইসলামী বিপ্লবকে পরিপূর্ণ জয়যুক্ত করণার্থে ত্যাগের স্পৃহা সৃষ্টি করা, (৫) সমাজসেবা ও দুঃস্থ মানবতার প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করা, (৬) রাজকীয় বিলাসিতা পরিহার করে সহজ-সরল জীবন-যাপন করা, (৭) জিহাদী ভাবধারা সৃষ্টি করা এবং যে কোন দুর্যোগ মুহূর্তে ধৈর্য ও সহনশীলতার অনুশীলন করা, (৮) সমাজ বিধ্বংসী সকল প্রকার অনাচার, কুসংস্কার ও রীতিনীতি উৎখাতের চেষ্টা করা, (৯) বিলাসিতার আড্ডাখানাসমুহের অবসান করা, যা সমাজকে আরাম প্রিয় ও দুর্বল করে তোলে। এ ছাড়া, শাহ্ আবদুল আযীয (রহ) রীতিমতো সপ্তাহে দু'বার মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী আদর্শ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও উপরিউক্ত বিষয়সমূহের ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে জনসভায় বক্তৃতা করতেন।

বাংলাদেশে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ চিন্তাধারার প্রভাব

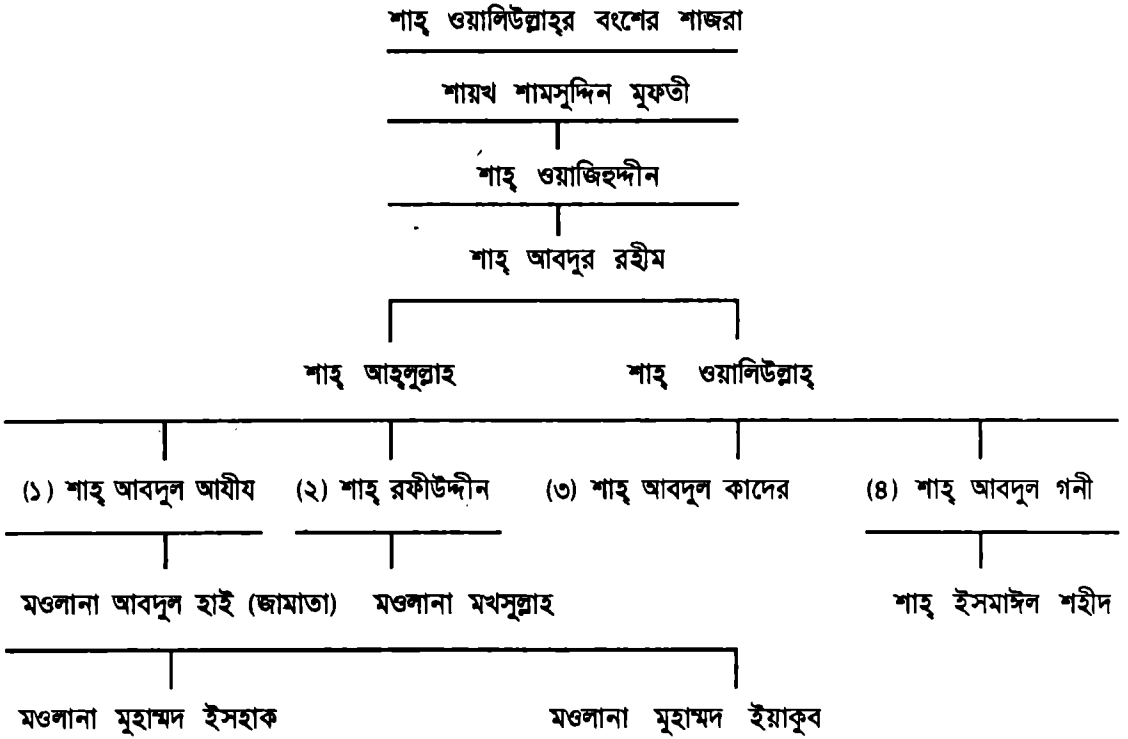
শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র চিন্তাধারা ও রচনাবলীর ফলে সার্বিকভাবে সমস্ত উপমহাদেশ উপকৃত হলেও বাংলাদেশে তাঁর চিন্তাধারার বিস্তার লাভের যে সব কারণ দেখা যায়, তন্মধ্যে দেওবন্দে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলিমরা ছাড়াও তার পূর্বে ১৭৮১ সালে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র শাগরিদ মওলবী মজদুদ্দীন ওরফে মোল্লা মদনের ব্যক্তিত্ব ও অধ্যাপনাও কম কাজ করেনি। তিনি ১৭৬৪ সালে দিল্লী থেকে কলকাতা আসেন। এখানে তিনি একান্ত অজ্ঞাত জীবন-যাপন করতেন। কিন্তু আগুন কখনও কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় থাকে না। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও আল্লাহভীরুতার সঙ্গে পরিচিত স্থানীয় মুসলমান সুধীবৃন্দ তাঁকে কাজে লাগাবার কথা চিন্তা করলেন। তাঁরা একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবলেন। তাঁরা এ ব্যাপারে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসকে অনুরোধ করলে তিনি তাঁদের কথায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে সায় দেন। তিনি মন্তব্য করলেন "হ্যাঁ, সরকারী কাজে সাহায্য করতে পারে এরূপ এক শ্রেণীর

www.amarboi.org

কর্মচারী তৈরীর জন্যও সরকারের এ প্রকার একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে।" অতপর ১৭৮১ সালের অক্টোবরে কলকাতা শহরের বৈঠকখানা অঞ্চলে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। আর মোল্লা মদন তারই প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন।

বস্তুত ঐ মাদ্রাসাই পরে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হিসাবে পরিচিত হয়। অবশ্য ঐ পরিবেশে কলকাতার উক্ত মাদ্রাসা থেকে ওয়ালিউল্লাহ'র চিন্তাধারার আশানুরূপ বিকাশ ঘটা কতদূর সম্ভব ছিল তা স্বতন্ত্র কথা। তবে আমরা বর্তমানে যতদূর দেখতে পাই, পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয় যে, এককালে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র চিন্তাধারা ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আন্দোলন ও আযাদী আন্দোলনের কর্মীদের দ্বারা যে দেওবন্দ দারুল উলুম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার কাজ প্রথম যে মহান ব্যক্তির দায়িত্বে শুরু হয়েছিল পরবর্তীকালে সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছুরিত আলোর ফলশ্রুতি হিসাবেই উমহাদেশে পাকিস্তানের ন্যায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সৃষ্টি হলো ঃ আজ ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলিম-উলামাদের কিছু সংখ্যক ছাড়া অনেকের মধ্যেই উক্ত বিপ্লবী ভবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় না? যুগ সমস্যার, যুগ জিজ্ঞাসা ও আধুনিক নানাবিধ বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারার চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করার মতো যে ধরনের এবং যে পরিমাণ যোগ্য আলিমের প্রয়োজন ছিল, ঐ সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তা পরিবেশন করতে সমর্থ হচ্ছে না, তারই পরিণতিতেই হয়তো যোগ্য ইসলামী নেতৃত্বের অভাব ঘটায় ইসলামের নামে এদেশ অর্জিত হলেও আজও এখানে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়ে উঠছে না বরং দিনের পর দিন পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে। সম্ভবত দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা-পদ্ধতি ও এ শিক্ষার মূল লক্ষ্য নির্ধারণের ব্যাপারে কোনরূপ ব্যতিক্রম অথবা দীনী চিন্তার গরমিলের দরুনই এমনটি হতে চলেছে। এ ব্যাপারে উলামা নেতৃবৃন্দের আজ নতুন করে ভাববার সময় এসেছে।

www.amarboi.org



www.amarboi.org

গ্রন্থাবলী

তাঁর গ্রন্থাবলীকে ছয় শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে কুরআন সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে তাঁর লিখিত কুরআন মজীদের তরজমা 'ফতহুর রহমান' উল্লেখযোগ্য। এটি কুরআনের সংক্ষিপ্ত অথচ জ্ঞানগর্ভ তরজমা। তাঁর এ পর্যায়ে গ্রন্থের মধ্যে 'মুকদ্দমা ফী তারজুমাতিল কুরআন', 'আল ফওযুল কবীর' এবং 'আল ফাতহুল কাবীর'ও রয়েছে। এ গুলোতে কুরআনের তরজমা ও ব্যাখ্যার মুলনীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থাবলী হাদীস সংক্রান্ত। এর মধ্যে ইমাম মালিকের বিশ্ববিখ্যাত মুয়াত্তার আরবী শরাহ মুসাওয়া ও 'মুসাফ্ফা' প্রসিদ্ধ। হাদীসে তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আন্‌নাওয়াদির মিনাল হাদীস আল দুররিশ-সামীন' ও 'শরহে তরজমা-এ-আবওয়াবে বুখারী' প্রসিদ্ধ।

তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে হচ্ছে ফিকাহ শাস্ত্র। এর মধ্যে রয়েছে (ক) 'আল ইনসাফ' (খ) ইকদুলজীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত্তাকলীদ। এসব গ্রন্থের মধ্যে তিনি ফকীহদের ইখতেলাফকে বিরোধিতা নয় বরং মতদ্বৈধতারূপে দেখিয়ে দিয়েছেন।

চতুর্থ শ্রেণীর গ্রন্থাবলী হচ্ছে তাসাউফ সংক্রান্ত। এর মধ্যে রয়েছে (ক) ফায়সালাতু ওয়াহ্‌দাতিল ওয়াজুদ ওয়াশ শাহুদ (খ) আল কওলুল জামীল, (গ) তাফহীমাতে-ইলাহিয়া (ঘ) আলভাফুল কুদুস (ঙ) আন-ফানসুল-আরিফী (চ) ফুয়ুযুল-হারামাইন (ছ) আলখায়রুল-কাসীর (জ) সাৎয়াত ও (ঝ) লুময়াত বিখ্যাত।

পঞ্চম শ্রেণীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে ঃ 'আলহুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'। তাঁর এ বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থটিকে ইসলামের ভাষ্য বলা চলে। মওলানা মানাজির আহ্‌সান গিলানীর ভাষায় 'আমি এ গ্রন্থটির ন্যায় মানব রচিত এমন কোন গ্রন্থ দেখিনি, যাতে ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান হিসেবে সুসংবদ্ধভাবে তুলে ধরা হয়েছে।'

www.amarboi.org

এ অমর গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণেতা বাংলার শ্রেষ্ঠতম সুফী চরিত্রের ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী সাহেব আজ থেকে প্রায় ৪৩ বছর পূর্বে উর্দু ভাষায় তাঁর লিখিত 'নেজামে তালীম' পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেন, "আমার মতে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহর (স) সুন্নাহর পরে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট কিতাব। কেননা, এতে এমন সব জ্ঞানসমৃদ্ধ বিষয় রয়েছে যা অপর কোন গ্রন্থে নাই, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কানে শোনেনি, এমনকি কেউ অন্তর দিয়েও উপলব্ধি করেনি। মূলত এটা হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা অথচ পূর্ণ নির্ভরযোগ্য–বরং বলা চলে মুহাম্মদী শরীয়তের নির্যাস।"

www.amarboi.org

ওয়ালিউল্লাহ্ আন্দোলনের প্রধান নেতা
শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ)

[ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম ফতওয়াদানকারী]

সাধারণত কোনো মহৎ চিন্তা–ভাবধারা বা আদর্শের উদ্ভাবকের পক্ষে নিজের চিন্তাধারাকে আপন জীবদ্দশাতেই পূর্ণাঙ্গরূপে সমাজে বাস্তবায়িত করা কিংবা এর ব্যাপক প্রসার দান সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। পরবর্তী যুগে তাঁর অনুসারীদের মধ্য থেকেই এ মহান কাজে কেউ এগিয়ে আসেন। এই উপমহাদেশে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের অগ্রদূত মহামনীষী ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রহ) (১৭০৩–১৭৬৭ খৃঃ) ইসলামী বিপ্লবের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর বেলায়ও ঠিক এমনটিই ঘটেছিল। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন জড়তাগ্রস্ত ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম জাতির সামনে দীর্ঘদিনের চিন্তা–গবেষণার ফলশ্রুতিরূপে ইসলামের বিপ্লবী ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন, আর সেই মহান লক্ষ্যকে কার্যকরী করার পথে যিনি সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিলেন, তিনিই হচ্ছেন শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ)। শাহ আবদুল আযীয ইমাম দার্শনিক শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভীর (রহ) জ্যেষ্ঠ পুত্র।

জন্ম ও শিক্ষা—দীক্ষা

শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ) সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের শাসনামলে অনুমান ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের প্রচলিত নিয়ম মাফিক তিনি নিজ গৃহেই প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁর শিক্ষার জন্য মওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আশেক এবং মওলানা খাজা মুহাম্মদ আমীনকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি তাঁদের নিকট থেকে প্রথমতঃ ফরাসী ও আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা লাভ করেন। পরে আরবী ফিকাহ্, উসুল, মানতেক, কালাম,

www.amarboi.org

আকায়েদ, অংক, জ্যোতিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। এসব জরুরী বিষয় শিক্ষা লাভের পর তের বছর বয়সে শাহ আবদুল আযীয (রহ) পিতার নিকট হাদীস ও তফসীর সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞানার্জন করে দু'বছর পরই সাফল্যের সনদ লাভ করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ্র (রহ) ইসলামী আন্দোলনের কর্মী বাহিনীর কেন্দ্রীয় সংস্থা কৈশোরেই আবদুল আযীয (রহ)-এর চারিত্রিক গুণাবলী, আল্লাহভীরুতা ও কর্মকুশলতা দেখে তাঁকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করার বিষয় চিন্তা করছিলেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই ওয়ালীউল্লাহর সংস্পর্শে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীবৃন্দের শীর্ষস্থানীয় নেতাগণ মহামান্য ওয়ালিউল্লাহ (রহ)-এর আদর্শের অনুসরণে তাঁকে গড়ে তোলার প্রতি বিশেষ যত্নবান হন। উল্লিখিত শিক্ষকদ্বয় 'ইলমে হাদীস ও ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনের মূলনীতি সম্পর্কে তাঁকে জ্ঞানগভীর করে তোলেন। ইসলামী আইনশাস্ত্র তথা ফিকাহ সম্পর্কে শাহ আবদুল আযীয (রহ)কে জ্ঞানসমৃদ্ধ করে তোলার জন্য যিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তিনি হলেন মওলানা নূরুল্লাহ। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ)-ছাত্র এবং আবদুল আযীয (রহ)-এর উস্তাদ এ তিন মহৎ ব্যক্তির দ্বারাই ওয়ালিউল্লাহ (রহ)-এর শিক্ষা এবং আদর্শের প্রসার ঘটেছিল। তাঁদের পাশাপাশি ওয়ালিউল্লাহ (রহ)-এর শাগরিদদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কমবয়সী আরেকটি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। ওয়ালিউল্লাহ (রহ)-এর সন্তানগণ এ শ্রেণীর সঙ্গেই শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতার তিরোধানের পর (১৭৬৩ খৃঃ) এই উভয় শ্রেণীর সমর্থনে ১৭ বছর বয়সের সময় তিনি পিতার স্থানে ইসলামী আন্দোলনের নেতা মনোনীত হন। দেশের তৎকালীন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, তামাদ্দুনিক ও ধর্মীয় বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে এই সুযোগ্য উত্তরাধিকারী কর্তৃক অনুসৃত কর্মসূচীর বদৌলতে উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা অনুশীলনের প্রচার ও সুদূর প্রসারী প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করে সঙ্গতভাবেই বলা চলে যে, শাহ আবদুল আযীয (রহ) এর নিজ যোগ্যতার কারণেই তাঁকে এই মহান পদে সমাসীন করা হয়েছিল-শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ)-এর 'ছাহেবযাদা' হবার মর্যাদার কারণে নয়। তাঁর দ্বারা উপমহাদেশে কুরআন হাদীস তথা ইসলামী শিক্ষার এত ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল যে, উপমহাদেশে এমন কোনো দ্বীনী শিক্ষা কেন্দ্র নেই, যা প্রত্যক্ষ বা

www.amarboi.org

পরোক্ষভাবে তাঁর শিক্ষা কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত নয়। এমন কি এশিয়ার অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রেও তাঁর শিক্ষার আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়েছিল।

শাহ আবদুল আযীয (রহ)—এর কর্মজীবন

যেহেতু মোঘল শাসনের পতন যুগেই শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর জন্ম, তাই এই মুসলিম রাজত্বের অধঃপতনের ধারাবাহিক চিত্র ও ভারতে মুসলিম আধিপত্য ক্ষুণ্ন হবার মূল কারণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু থেকেই তাঁর মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তিনি মুসলমানদের মুক্তির পথ খুঁজছিলেন। উপ-মহাদেশে ইসলাম ও ইসলামী কৃষ্টি সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা এবং এর ভিত্তিতে পুনরায় এখানে ইসলামী আন্দোলনের দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করার উদ্দেশ্যে সময়োপযোগী এমন কি কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে, তিনি তাই ভাবছিলেন। অবশেষে শাহ আবদুল আযীয (রহ) এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন, যার ফলে তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদের অন্তরে চিরদিন অমর ও শ্রদ্ধেয় সত্তা হিসেবে বিরাজ করবেন। এ উদ্দেশ্যে প্রথম তিনি তাঁর পিতার দর্শন মাফিক ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এর পূর্বশর্ত হিসেবে মুসলমানদের ইসলামী জীবনবোধের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করাবার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। তিনি দিল্লীস্থ পৈত্রিক শিক্ষাদান কেন্দ্রের মাধ্যমেই এ কাজ শুরু করেন। এটা ছিল সত্যিকার অর্থে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ)-এর দর্শন ও শিক্ষার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর পিতামহ শাহ আবদুর রহীমের "রহীমিয়া মাদ্রাসায়" ছাত্র সংকুলান হচ্ছিল না দেখে সম্রাট মুহাম্মদ শাহ মহামনীষি ওয়ালীউল্লাহকে দ্বীনী শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য এই সরকারী ভবনটি ওয়াকফ করেছিলেন।

শিক্ষার মূলনীতি

ভাবী ইসলামী রেনেসাঁর এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মূলনীতি হিসাবে যে সব বিষয় গৃহীত হলো, তা হচ্ছে (১) কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার ব্যাপক

www.amarboi.org

প্রসার দেওয়া এবং ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাধারাকে মন-মগজ দিয়ে উপলব্ধি করা। (২) আল্লাহ ভীতি ও আদর্শ জীবন গঠনের প্রেরণা সৃষ্টি করা, (৩) রাজতন্ত্র ও সরকার তোষণ মনোভাব মন-মস্তিষ্ক থেকে দূর করা এবং ইসলামী বিপ্লবকে পরিপূর্ণ জয়যুক্ত করার জন্য মানুষের মধ্যে ত্যাগের স্পৃহা সৃষ্টি করা, (৪) সমাজসেবা ও দুস্থ মানবতার প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করা, (৫) রাজকীয় বিলাসিতা পরিহার করে সহজ সরল জীবন-যাপন করা, (৬) ত্যাগী ভাবধারা সৃষ্টি করা এবং যে কোন দুর্যোগ মুহূর্তে ধৈর্য ও সহনশীলতার অনুশীলন করা, (৭) সমাজ বিধ্বংসী সকল প্রকার অনাচার, কুসংস্কার ও রীতিনীতি উৎখাতের চেষ্টা করা এবং বিলাসিতার আখড়াসমূহের অবসান করা-যা সমাজকে আরামপ্রিয় ও দুর্বল করে তোলে।এছাড়া শাহ আবদুল আযীয (রহ) রীতিমতো সপ্তাহে দু'বার ইসলামী আদর্শ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জটিল জটিল সমস্যাবলী নিয়ে সাধারণ সভায় বক্তৃতা করতেন।

কতিপয় বিখ্যাত ছাত্র

তাঁর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত সংগামী যেসব ছাত্রবৃন্দ উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁদের তালিকা সুদীর্ঘ। এখানে কতিপয় বিখ্যাত ছাত্রের নাম প্রদত্ত হলো। এঁদের অধকাংশই পরবর্তী পর্যায়ে সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ)-এর নেতৃত্বে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে শিখ ও ইংরেজদের হাত থেকে আজাদ করার মরণপণ ব্রত নিয়ে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, শাহ্ আবদুল আযীয (রহ) ঐ সময়ও যে কয়দিন জীবিত ছিলেন, বার্ধক্যপীড়াকে উপেক্ষা করে পরামর্শ, পরিকল্পনা ও বক্তৃতা দ্বারা এই সংগ্রামী বাহিনীকে অনুপ্রাণিত করে গেছেন। তাঁর খ্যাতনামা ছাত্রের নাম হচ্ছে ঃ (১) মওলানা রফীউদ্দিন, (২) মওলানা শাহ আবদুল কাদের (৩) মওলানা আবদুল গনী (আবদুল আযীযের ভ্রাতৃবৃন্দ), (৪) মওলানা আবদুল হাই (জামাতা) (৫) মওলানা মুহাম্মদ ইসহাক, (৬) মওলানা মুহাম্মদ এয়াকুব (নাতিদ্বয়), (৭) মওলানা মাখসূসুল্লাহ (ভ্রাতুষ্পুত্র), (৮) মওলানা ইসমাইল শহীদ দেহলভী (ভ্রাতুষ্পুত্র), (৯) সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলবী,

www.amarboi.org

(১০) মওলানা রশীদুদ্দীন, (১১) মওলানা মুফতী সদরুদ্দীন, (১২) হযরত শাহ গোলাম আলী, (১৩) মওলানা করীমুল্লাহ, (১৪) মওলানা মীর মাহবুব আলী, (১৫) মওলানা আবদুল খালেক, (১৬) মওলানা হাসান আলী লক্ষ্ণৌবী ও (১৭) মওলানা হোসাইন আহমদ মালীহাবাদী।

(উল্লেখ্য যে, সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ) ১৮২৬ সালে শিখদের বিরুদ্ধে অকোরার যুদ্ধ জয়ের পর এ দলের "আমীরুল মুমিনীন" খেতাব প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এর নেতৃত্ব ছিল মওলানা ইসহাক সাহেবের হাতে)।

সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি

ঈসায়ী ১৭৪৭ সাল। সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের যুগ। মোগল শাসন ব্যবস্থা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। সুদূর কাবুল থেকে আরাকান পর্যন্ত যে মোঘল শাসকদের প্রতাপ ছিল, আজ সেখানে সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর দিল্লীর সিংহাসনে প্রভাবশালী আমীরদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে আছেন। বিভিন্ন প্রদেশ এক এক করে দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের হাত ছাড়া হয়ে গেছে। দু'শ বছর যাবত মোঘল বাদশাহগণ ভারতের বিভিন্ন ভূখন্ডের সমন্বয়ে যে মহাসাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করেছিলেন তা খন্ডবিখন্ড হয়ে উপমহাদেশে বহু স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে। ন্যায়পরায়ণ সাধক সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮–১৭০৭ খৃঃ) পর থেকেই মোঘল সাম্রাজ্যের ফাটল ধরতে থাকে। আওরঙ্গজেবের তিরোধানের পর মোঘলদের চিরাচরিত উত্তরাধিকার সংঘর্ষে শাহযাদা মুয়াযযম তথা প্রথম বাহাদুরশাহ বিজয়ী হন। তিনি ৫ বছর রাজত্ব করেন। সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেবের পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যেসব শাহজাদা স্বল্পকালের জন্য কিংবা দীর্ঘকাল পর্যন্ত দিল্লীর শাহী সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তাঁরা হলেন ঃ (১) প্রথম বাহাদুরশাহ, (২) মুয়েযযুদ্দীন জাহাদারশাহ, (৩) ফররুখ সিয়ার, (৪) রফীউদ্দারাজাত, (৫) রফীউদ্দৌলা, (৬) মুহাম্মদ শাহ, (৭) আহমদ শাহ, (৮) দ্বিতীয় আলমগীর, (৯) শাহে আলম (১০) দ্বিতীয় আকবর ও (১১) শেষ সম্রাট বাহাদুরশাহ জাফর। তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ শাহ, দ্বিতীয় আলমগীর এবং শাহে আলমের সম্রাট–জীবনই

www.amarboi.org

অধিককাল স্থায়ী ছিল। এঁদের সকলেই শাসন পরিচালনার ব্যাপারে দুর্বল ও অকর্মন্য সম্রাট ছিলেন এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত উজীর ও আমীরুল ওমারাদের ক্রীড়নক ছিলেন।

শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ) দ্বিতীয় আলমগীরের (১৭৪১–১৭৫৯ খৃঃ) যুগ থেকে সম্রাট শাহে আলমের যুগের (১৭৫৯–১৮০৬) পরেও ছয় বছর এই দুর্ভাগা মুসলিম রাজত্বের পরিণতি স্বচক্ষে লক্ষ্য করেছেন। এঁদের রাজত্বকালে বাংলা, (নবাব আলীবর্দীর শাসনকাল) অযোধ্যা এবং দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদের শাসনকর্তাগণ কার্যত স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতেন। মুসলিম আমীরগণ কেউ ভারতীয়, কেউ ইরানী এবং কেউ তুরানী মোঘল ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শিয়া–সুন্নী বিরোধও ছিল প্রকট। তাঁদের পরস্পরের উপর প্রাধান্য লাভের প্রতিযোগিতা সাম্রাজ্যকে আরও দুর্বল করেছিলেন। মারাঠাদের অভ্যুত্থান, শিখ ও জাঠদের শক্তি মোঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে অধিক বিপন্ন করে তুলেছিল। দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নেজামুল মুলক আসেফজাহ মারাঠাদের সহায়তায় অযোধ্যার শাসক মীর মুহাম্মদ আমীন বুরহানুল মূলক নওয়াব সায়াদাত খাঁকে ডিঙ্গিয়ে কেন্দ্রীয় শাসক সম্রাট মুহাম্মদ শাহের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হলে, সায়াদাত খাঁ ও অন্যান্য শিয়া কর্মচারী প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে ইরান থেকে নাদির শাহকে দিল্লী আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। নাদির শাহ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে সর্বশেষ প্রচন্ড হামলা চালিয়ে কাবুল, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের কিছু অংশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। আভ্যন্তরীণ এসব গোলযোগের সুযোগ নেয়ার জন্য বিদেশী শত্রু ইংরেজ ওঁৎ পেতে বসেছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত ও নিহত করে তারা বাংলা–বিহার–উড়িষ্যা দখল করে নেয়।

শিখ ও মারাঠাদের অকথ্য জুলুম–অত্যাচারে মুসলমানদের জানমাল ও ইজ্জৎ আবরুর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হতে থাকে। ক্রীড়নক সম্রাটের প্রতিকারের কোনই ক্ষমতা ছিল না। তাদের জুলুম থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার চিন্তা সকলকে ভাবিয়ে তুলল। খোদ আমীরুল উমারাও অস্থির ছিলেন। শাহী দরবারে প্রধান কর্মকর্তা নাজীবুদ্দৌলা হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ)

www.amarboi.org

এর ভাবশিষ্য ছিলেন। শাহ সাহেবের অভিপ্রায় অনুযায়ী নাজীবুদ্দৌলা ও তাঁর সঙ্গিগণ মারাঠাদের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষার জন্য কান্দাহারের আহমদ শাহ্ আবদালীকে দিল্লী আগমনের আমন্ত্রণ জানান। আহমদ শাহ দুররানী তথা আব্দালী পলাশী যুদ্ধের সাড়ে চার বছর পর ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপথের সর্বশেষ যুদ্ধে মারাঠাদেরকে ভীষণভাবে পরাস্ত করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ)-এর অভিপ্রায় অনুযায়ী আহমদ শাহের দিল্লী আগমনের সমালোচনা করেছেন। তাঁদের এই সমালোচনা যে ভ্রান্ত, তার বড় প্রমাণ হলো আহমদ শাহ আবদালীর পানি পথের যুদ্ধে বিজয়োত্তর কালের ঘটনাবলী। তিনি পানি পথের যুদ্ধের পর দিল্লী দখল করে বসে থাকেননি, বরং সম্রাট শাহে আলমকে সিংহাসনে বসিয়ে সূজাউদ্দৌলাকে উজীর ও নাজীবুদ্দৌলাকে আমীরুল উমারা পদে বহাল করে স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন। (তাযকেরায়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ) গাযী আব্দালী মারাঠা শত্রুদের দমন করে মোঘল সাম্রাজ্যকে ইসলামপ্রিয় রুহীলা পাঠান নেতাদের হাতে তুলে দিলেও তৎকালীন অযোগ্য মোঘল সম্রাট তার থেকে কোনরূপ লাভবান হতে পারেননি। পানি পথের শেষ যুদ্ধের সময় শাহ আবদুল আযীয যৌবনে পদার্পণ করেছেন। ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ) পানিপথ যুদ্ধের ৬ বছর পর ইনতিকাল করেন। উল্লেখযোগ্য যে, মারাঠাগণ পরে শক্তি সঞ্চয় করে শীয়া আমীরুল উমারা নজফ আলী খাঁর (১৭৭৩-১৭৮২ খৃঃ-কর্তৃত্বকাল) মৃত্যুর পর ২০ বছর যাবত দিল্লীর কর্তা ছিল। সম্রাট তাদের কথায়ই ওঠা-বসা করতেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন অংশে দেশী-বিদেশী কর্তৃত্বে অনেক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো এবং নামে মাত্র দিল্লী সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দেখানো হতো। সম্রাটগণ নিজ ব্যর্থতাবশত কার্যত শাসকের মর্যাদা হারিয়ে বসলেন। আব্বাসীয় খেলাফতের পতন যুগে যেমন বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসক বাগদাদের নামে মাত্র খলীফাদেরকে মৌখিক আনুগত্য জানাতেন, তেমনি পতন যুগের মোঘল সম্রাটদের প্রতিও আঞ্চলিক শাসকগণ মৌখিক আনুগত্য ও শ্রদ্ধা জানাতেন। আর দু'এক অঞ্চল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট শুধু বাৎসরিক নির্ধারিত রাজস্ব বা অধিকৃত

www.amarboi.org

এলাকা শাসনের আনুষ্ঠানিক অনুমতি সনদ বাবদ নজরানা আসতো। এরূপ করার একমাত্র কারণ ছিল জনগণের ভয়। কেননা, ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় জনগণের এটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, দেশের আসল মালিক হচ্ছেন দীর্ঘকাল স্থায়ী সেই দিল্লীর রাজা-বাদশাহগণ। তাই যিনিই আঞ্চলিক শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতেন না কেন, বাধ্য হয়েই তাঁকে মোঘল বাদশাহ্দেরকে মুরব্বী মানতে হতো। বিদ্রোহী শাসকদেরও চেষ্টা থাকতো যাতে বাদশাহ্র নিকট থেকে অধিকৃত এলাকার বৈধ শাসনের সনদ লাভ করতে পারেন। স্বয়ং ইংরেজদেরকেও দীর্ঘ দিন যাবত তা করতে হয়েছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহে আলমের স্বপক্ষে মারাঠা শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করে ইংরেজরা যখন পূর্ণরূপে দিল্লীতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং সম্রাট শাহে আলম ইংরেজদের আশ্রয়ে বসবাস করতে থাকেন তখন কার্যত গোটা ভারতে ইংরেজ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভূত্ব চলা সত্ত্বেও তাদেরকে প্রকাশ্যে বাদশাহের আনুগত্য দেখাতে হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে এক চুক্তিতে ইংরেজরা তাকে দিল্লীর লালকেল্লা, শহর এলাকা এবং এলাহাবাদ এবং গাজীপুরের জায়গীর দিয়ে সমগ্র ভারতে তাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কায়েম করে।

শাহ আবদুল আযীয (রহ) ভারতবাসী মুসলমানদের এ অবস্থাও দেখতে পেয়েছিলেন যে, কিভাবে ইংরেজগণ ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ জয়ের পর থেকে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী দখল পর্যন্ত একের পর এক দিল্লী কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলিম-অমুসলিম স্বাধীন শক্তিগুলোকে ধ্বংস বা বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেছিল। কিরূপে প্রচন্ড শক্তি ব্যয় করে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ)-এর চিন্তায় উদ্বুদ্ধ মহীশুরের বীর সুলতান টীপুকে বিপর্যস্ত, পরাজিত ও নিহত করে সমগ্র ভারতে নিজেদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারপর থেকে এ দেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা সুদৃঢ়করণ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা-সততা, ধ্যান-ধারণা, কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রসার দান ও এদেশের ঐতিহ্যবাহী শাসক জাতি মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্যমুখী ও হীনমনা করে গড়ে তোলার কি সব ষড়যন্ত্র শুরু করা হয়, তিনি তাও প্রত্যক্ষ করলেন। সেই দুর্দিনে এ ভারতীয় মৃতপ্রায় মুসলিম জাতির দেহে প্রাণ

www.amarboi.org

সঞ্চারের জন্য এবং পুনরায় তাকে বল-বীর্যে বিশ্বের দরবারে সরফরাজ জাতিরূপে দাঁড় করাবার উদ্দেশ্যে একমাত্র এই সাধক মনীষী শাহ আবদুল আযীযই নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন।

সরকারের দুর্ব্যবহার ও তার পটভূমি

শাহী পরিবারে সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেবের আমল থেকেই ওয়ালি উল্লাহ পরিবারের একটি আলাদা মর্যাদা স্বীকৃত ছিল, যদিও বহু অনুরোধ উপরোধ ও বিরাট অংকের ভাতার আকর্ষণ কোনো দিনই তাঁদেরকে শাহী দরবারের সংস্পর্শে নিতে পারেনি। সম্রাট আলমগীর কর্তৃক বিশ্ববিখ্যাত ইসামী আইনশাস্ত্র 'ফতওয়ায়ে আলমগীরী' গ্রন্থ রচনায় ওয়ালীউল্লাহর পিতা শাহ আবদুর রহীমকে অংশগ্রহণের অনুরোধ[১] সম্রাট মুহাম্মদ শাহ কর্তৃক পুরাতন রহিমীয়া মাদ্রাসায় ছাত্রদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় ওয়ালী উল্লাহ (রহ)কে তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিরাট সরকারী ভবন ছেড়ে দেওয়া এবং তাঁরই অভিপ্রায়ে আমীরুল উমারা নাজীবুদ্দৌলা কর্তৃক মারাঠা দমন উদ্দেশ্যে গাযী আহমদ শাহ আবদালীকে আমন্ত্রণ জানানো-এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এভাবে সুন্নী উজীর, আমীর উমরাগণ ও তাঁদের সন্তানদের অনেকেই ওয়ালিউল্লাহ (রহ)-এর পরিবারকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কিন্তু সম্রাট হুমায়ুন কর্তৃক শের শাহকে দমন করার উদ্দেশ্যে একবার ইরান থেকে সামরিক সাহায্য নেয়ার পর থেকে মোঘল শাসনযন্ত্রে শীয়াদের যে প্রভাব বেড়ে চলেছিল, তারই সুদূরপ্রসারী প্রভাবে সেনাবাহিনী ও শাসনযন্ত্রের ক্ষেত্রে উজির-নাজির ও আমীর-উমরার মধ্যেও একটি বিরাট শীয়া দল প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। সম্রাট শাহে আলমের যুগে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে যখন আমীরুল উমারা নাজীবুদ্দৌলার ইনতিকাল হয়, তখন তাঁর পুত্র ইংরেজ বিদ্বেষী জাবেতা খাঁ আমীরুল-উমারা নিযুক্ত হন। কিন্তু সুজাউদ্দৌলার প্রচেষ্টায় জাবেতার পরিবর্তে ইংরেজদের ক্রীড়নক নজফ আলী খাঁ যখন আমীরুল উমারা পদে আসেন (১৭৭৩-১৭৮১ খৃঃ)

১. তিনি সরকারী চাকরির প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন বলে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অবশ্য সংশ্লিষ্ট বোর্ডকে বাইরে থেকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

www.amarboi.org

তখন শাহ আবদুল আযীয তথা ওয়ালিউল্লাহ পরিবারের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। কেননা শীয়া কর্মকর্তাগণ তাঁদের এই দ্বীনী আন্দোলনকে মোটেই পছন্দ করতেন না।

এটাও আশ্চার্যের কিছু ছিল না যে, ইংরেজের মতো সুচতুর জাতি–শাহ্ আবদুল আযীয কর্তৃক দিল্লীতে বসে ওয়ালীউল্লাহ্র বিপ্লবী দর্শনের যে প্রচার ও তার ভিত্তিতে জনসংগঠনের কাজ চলছিল,–তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে তারা নিজেদের ক্রীড়নক নজফ আলী খাঁর দ্বারা এরূপ করিয়ে থাকবেন। পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজগণ কর্তৃক এক শ্রেণীর তল্পীবাহক দ্বারা তাঁদের ইসলামী আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলনরূপে জনসমক্ষে চিত্রিত করা তারই সাক্ষ্য বহন করে। যা হোক, এটা এক দুঃখজনক আশ্চর্য মিল যে, মোঘল শাসনের শেষের দিকে তা উপমহাদেশে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় মোঘল শাসনযন্ত্রের আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত যে কয়জন ব্যক্তির সহায়তা ছিল, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন শীয়া। যেমন বাংলার মীরজাফর, মহীশূরের বীর টিপুর প্রধানমন্ত্রী মীর সাদেক, লাক্ষ্ণৌর নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লীর সর্বশেষ শীয়া মুসলিম আমীরুল উমারা নজফ আলী খাঁ–(ওলামায়ে হিন্দকা শানদার মাযী পৃঃ ৭৮)

গুন্ডামীর সম্মুখীন

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ) বলেন যে, "আমরা দিল্লীতে বসবাস করা কালে নিজেদের হাতেই (ইংরেজ তোষামোদকারী ও শীয়া মুসলমান) আমাকে অকথ্য জ্বালা–যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। আমাদের প্রতি দুর্বৃত্ত, বখাটে ও দুষ্কৃতিকারীদেরকে লেলিয়ে দেওয়া হতো। তারা আমাদের ঘরের ছাদে তাজিয়া রেখে দিত। পবিত্র রমযানে তারাবীহ হচ্ছে, হঠাৎ মদমত্তা কোন দুশ্চরিত্রা নারীকে মসজিদে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো, আর সে হাফেজ শিরাজীর কবিতা আবৃত্তি করে নাচানাচি করতো। গুন্ডারা বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢোল বাজাতো আর অশোভনীয় উক্তি ও বিশ্রী ধ্বনি দিতো। এসব গুন্ডার উপযুক্ত জবাব দিতে গেলে মূল আন্দোলনের ক্ষতির আশংকা ছিল।"(১)

১. মলফুযাত পৃঃ ৫৪

www.amarboi.org

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

"গুন্ডামী দ্বারা কোনো ফলোদয় না হওয়াতে হয়রত শাহ্ আবদুল আযীয (রহ)-এর বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়। অবশ্য অন্য প্রভাব খাটিয়ে পরে এই নির্দেশ প্রত্যাহার করানো হয়।"[১]

নির্বাসন

একটি মামলা রফাদফা হতে না হতেই তাঁর বিরুদ্ধে আর একটি রুজু করা হতো। সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির মামলা প্রত্যাহৃত হবার পর তাঁর প্রতি সপরিবারে দেশ ত্যাগের হুকুম আসলো। এবার কোন প্রভাবেও কাজ হলো না। শাহ আবদুল আযীয (রহ) নিজ ভ্রাতৃবৃন্দ, পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও অনুসারীগণসহ পদব্রজে দিল্লী ছেড়ে শাহেদরাহ্ চলে যান। সেখান থেকে হযরত শাহ ফখরুদ্দীন (রহ)-যিনি বাজেয়াপ্তির হুকুম রদ করেছিলেন, তাদের যান-বাবহনের ব্যবস্থা করেন।"[২]

প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র

শুধু তাই নয়। শাহ আবদুল আযীয (রহ) কে কুচক্রীরা দুই দুইবার বিষপ্রয়োগে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্র অনুগ্রহে তাদের ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন হয়ে যায়। তবে তাঁর শরীরের উপর এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। জানা যায়, একবার তাঁর গায়ে টিকটিকির মলম ডলে দেওয়ায় তাঁর শরীরে শ্বেত রোগের সৃষ্টি হয়েছিল। এসব কষ্ট নির্যাতনের ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন, রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছিল এবং শ্বেত রোগসহ আরও নানাবিধ ব্যাধির তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন।[৩]

---

(১) মানাকেবে ফরীদী (২) ওলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী (৩) আরওয়াহে সালাসা।

www.amarboi.org

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পটভূমি

দুর্ভাগ্যজনক হলেও এ কথা সত্য যে, ইংরেজশক্তির বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালের ঐতিহাসিক বিপ্লব এবং উত্তরকালে পাক ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমাদের অধিকাংশ ঐতিহাসিকই আলিম সমাজের ভূমিকাকে আশানুরূপভাবে প্রাধান্য দিতে যে কার্পণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনিভাবে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পটভূমি রচনায় আলিমদের যে একক প্রভাব কাজ করেছিল, সে ক্ষেত্রেও তারা ঐ একই সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বাস্তব ঘটনা ও অনেক নির্ভরযোগ্য উর্দূ-ফারসী ইতিহাস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, উপমহাদেশের পরাজিত ও ভগ্নোৎসাহ মুসলমানদের মনে ইংরেজবিরোধী যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, তার প্রধানতম কারণ ছিল একটি নির্ভীক ও বৈপ্লবিক ফতোয়া। এই ফতোয়াদাতা ছিলেন উপমহাদেশের তদানীন্তন সর্ব-জনমান্য বুযুর্গ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ)। এই ফতোয়া প্রকাশিত হবার পরই কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুসলিম জাতি আন্দোলনের পথ খুঁজে পায়। এই ফতোয়া সকল শ্রেণীর মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করে তোলে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৭৬৫ খৃঃ যখন পাটনা এবং বক্সারের যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলা (অযোধ্যা) ও শাহে আলম পরাস্ত হন, তখন সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লী দখল করা ইংরেজদের পক্ষে তেমন অসুবিধার কিছু ছিল না। কিন্তু সুচতুর ইংরেজগণ নিজেদের বেনিয়া বুদ্ধি খাঁটিয়ে জনগণের মধ্যে প্রথমেই ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না করে কয়েক বছর অপেক্ষা করে অতপর ১৮০৩ খৃঃ দিল্লী দখল করে। কিন্তু এখানেও তারা চতুরতার আশ্রয় নেয়। প্রথমে সম্রাটকে মসনদচ্যুত না করায় এবং তার থেকে শাহী মুকুট ছিনিয়ে নেয়ার পরিবর্তে ইংল্যান্ডের সম্রাটের ন্যায় তাঁকে পার্লামেন্ট-স্বীকৃত ক্ষমতাহীন প্রধান করে রাখা হলো। তখন থেকে সমস্ত ক্ষমতা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে গেলো। যার ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, জনগণ হচ্ছে আল্লাহর, দেশ সম্রাটের আর হুকুম কোম্পানী বাহাদুরের।

www.amarboi.org

পরিস্থিতি অত্যন্ত নাযুক। একদিকে তারা আল্লাহর থেকে ও তার অসীম কর্তৃত্বকে স্বীকার করে ধর্মীয় কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে নিলো এবং অপরদিকে মুঘল সম্রাটের রাজত্ব ও তৈমুরী খান্দানের সম্মান সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো। রাষ্ট্রীয় কায়কারবার যা হিন্দু-মুসলমান উজীর ও আমীর-উমারাদের হাতে সোপর্দ ছিল, এখন থেকে তা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ন্যস্ত হলো। শুধু তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করারই প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো না বরং মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ের ফয়সালা মুসলমান কাজীদের হাতে এবং হিন্দুদের ফয়সালা হিন্দু পন্ডিতদের হাতে অর্পণ করা হলো। এভাবে তারা ভারতীয়দেরকে তথাকথিত 'কালচারাল অটোনমী' প্রদান করলো। সাধারণ মানুষ সব সময়ই অসচেতন থাকে, ঐ সময় সমাজের বুদ্ধিজীবীরাও এই পার্থক্য তথা চক্রান্তটি ধরতে পারেননি। তারা ভাবলেন, যখন আমাদের ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক অধিকার ঠিক থাকবে এবং সম্রাটকেও মসনদচ্যুত করা হবে না, তাতে আর আপত্তির কি আছে।

জটিল প্রশ্ন

এ জটিল পরিস্থিতিকে 'আজাদী' বলা হবে, না 'গোলামী'? ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে এটা এক জটিল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ালো যে, এ অবস্থায় ভারত কি পূর্বের ন্যায় 'দারুল ইসলাম'রূপে আখ্যায়িত হবে, না 'দারুল হরব' (ইসলামী পরিভাষায় দারুল হরব সে দেশকেই বলা হয়, যে দেশে ইসলাম বিরোধী সরকারের সঙ্গে জিহাদ করা হয় অথবা যেখান থেকে ধর্মীয় নির্দেশ অনুযায়ী হিজরত করতে হয়) বলতে হবে কিংবা ঐ অবস্থায় ভারতকে 'দারুল আমান' বলা হবে, যেখানে সরকার অমুসলিম হলেও মুসলমানদের জানমাল নিরাপদ এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকে? আর ঐ দৃষ্টিতে সেখানে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সঙ্গে লড়াই করাও অবৈধ।

উনিশ শতকের শুরুতে এ বিষয়টি তদানীন্তন ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও ওলামায়ে কেরামের সামনে এক জটিল প্রশ্ন হয়ে দেখা দিলো।

www.amarboi.org

এটা এমন এক প্রশ্ন ছিল, যেখানে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ ছিল এবং ইংরেজের ন্যায় ধূর্ত জাতির পক্ষে এই মতদ্বৈদতার সুযোগ নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার যথেষ্ট মওকা ছিল। অবশ্য তারা তাই করেছে এবং সফলকামও হয়েছে। তবে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ) শিক্ষায়তনে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ইসলামী আন্দোলনের কোন কর্মীকে এহেন ধাপ্পাবাজির শিকারে পরিণত করা সহজ ছিল না। তাই ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ) তখন পূর্বোক্ত ফতোয়া প্রকাশ করে ইসলামী আন্দোলনের নতুন দ্বার উন্মোচিত করেন। (ফতোয়াটি..... পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

১৮৫৭ সালে

সাধারণ মুসলমান ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রতাপের সামনে নিজেদেরকে নিঃসহায় মনে করছিল। তাদের মধ্যে এরূপ যোগ্যতা ছিল না যে, ইংরেজ শক্তির মুকাবিলায় ঐ পরিস্থিতিতে বিরূপ কর্মসূচী বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই ফতোয়ার ফলে তারা কর্মনীতি নির্বাচনের পথ খুঁজে পেলো

কলমের জিহাদ

শাহ আবদুল আযীয (রহ) উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণের জন্য কেবল ইংরেজ বিরোধী বিপ্লবাত্মক ফতোয়া জারি, শিক্ষা দান, বক্তৃতা ও জনসংগঠনই করেননি, তিনি মানুষের চিন্তার গভীরে ওয়ালিউল্লাহ (রহ)-এর ইসলামী রেনেসাঁর বাণীকে স্থায়ীভাবে বসিয়ে দেওয়ার জন্য মসীর অস্ত্রও হাতে নিয়েছিলেন। তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হচ্ছে ঃ (১) তফসীরে আযীযী, (২) তোহফায়ে এস্না আশারিয়া (শিয়াদের ভ্রান্ত মতবাদ খন্ডনে লিখিত এ কিতাবটির জবাব আজও তারা দিতে পারেনি), (৩) বুসতানুল মুহাদ্দেসীন, (৪) আযীযুল ইকতেবাস, (৫) সিয়ারুশ শাহাদাতাইন, (৬) ফতোয়ায়ে আযীযী (৭) ফত্হুল আযীয (ওয়ালিউল্লাহ (রহ)-এর ফত্হুর রহমানের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)। এছাড়া তিনি "হাওয়াশী বর শারহে আকায়েদ", এজাযুল বালাগত প্রভৃতি বহু পুস্তিকা এবং হাশিয়া রচনা করেন।

www.amarboi.org

অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে আবদুল আযীয (রহ)—এর আন্দোলনের প্রভাব

শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর শিক্ষার প্রভাব হেজাজের মাধ্যমে ভারতের বাইরেও পৌঁছেছিল। শেখ খালেদ কুর্দীর দ্বারা ইস্তাম্বুলে তাঁর শিক্ষার চর্চা হতো। তিনি কুর্দী ইসলামী বিপ্লবের অন্যতম মুজাহিদ মওলানা গোলাম আলীর নিকট শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি ইসমাইল শহীদের মধ্যস্থতায় শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাছাড়া মওলানা গোলাম আলীও শাহ সাহেবের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। ইস্তাম্বুলের আলেম সমাজ শাহ আবদুল আযীয (রহ) কে সেখানে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছিলেন "আপনি ইস্তাম্বুল তশরীফ আনুন, এখানকার সুধীমহল আপনার নেতৃত্বে কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছে।" শাহ আবদুল আযীয (রহ) ভারতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ)-এর মহান কাজকে অসম্পূর্ণ রেখে বিদেশ গমন সমীচীন মনে করেননি। মূলত তার বিদেশ নাগিয়ে সাইয়েদ আমহদ ব্রেলভী শাহ ইসমাইল শহীদ, মওলানা আবদুল হাই প্রমুখকে ইসলামী প্রশিক্ষণ দানের ফলে পরবর্তী পর্যায়ে উপমহাদেশে ইসলামের যেই বিরাট কাজ হয়েছে, সেটার মূল্য লাখো বেশী। তাঁর সেই অবদানের কথা ইতিপূর্বে "ওয়ালিউল্লাহ্র কর্মীদল" শীর্ষক আলোচনায় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

ওফাত

মহাপুরুষ শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ) ১১৩৯ হিঃ মুতাবিক ১৮২৮ খৃঃ উপমহাদেশের মুসলমানকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে এ মর জগৎ থেকে বিদায় নেন। তাঁর ইনতিকালের পূর্বে নিজস্ব কুতুবখানাটি তিনি মওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাককে দান করেন। খান্দানের অন্যান্য বুযুর্গানের ন্যায় তাঁকে দিল্লীর প্রসিদ্ধ কবরস্তান লেহেন্দীয়ালে দাফন করা হয়। তারপর উক্ত মাদ্রাসায় তাঁর ভ্রাতাগণ পর্যায়ক্রমে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। মাদ্রাসাটি

www.amarboi.org

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের সময় ধ্বংস হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও এখনও উক্ত এলাকাটি মাদ্রাসা মহল্লা নামে পরিচিত। "তাবাকাতে নাসেরিয়া" ও "ফাওয়ায়েদুল ফাওয়ায়েদে" উল্লেখ আছে যে, ঐ সময় সরকারী ব্যয়ে দিল্লীতে মাদ্রাসা-এ-মুয়োবিয়া 'মাদ্রাসা-এ-নাসেরিয়া' ও মাদ্রাসা এ- ফিরোযিয়া' প্রভৃতি কয়েকটি মাদ্রাসাও চালু ছিল।

আবদুল আযীয (রহ)—এর জীবনের কতিপয় ঘটনা

তিনি কেবল ইসলামিয়াতেই একজন দক্ষ আলিম ছিলেন না, আরবী সাহিত্য ও কাব্যেও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তিনি আরবী কবিতায় শিখ ও মারাঠাদের জুলুম নির্যাতনের বিবরণ দিয়ে তাঁর চাচার নিকট ব্যাথাভারাক্রান্ত মনে যে পত্রটি লিখেছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে নিম্নরূপ?

"আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে
শিখ ও মারাঠাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।
তাদেরকে একটুও ফুরসৎ না দিয়ে
অত্যন্ত মারাত্মক শাস্তি দিন।"
"শিখ মারাঠারা অসংখ্য মানব সন্তানকে হত্যা করেছে,
তারা নিরপরাধ মানুষকে যন্ত্রণা দিতেছে।"[১]

এছাড়াও আরবীতে তাঁর রচিত বহু তত্ত্বপূর্ণ ও রসালো কবিতারও সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি একবার মুসলিম শাসনাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লীর প্রশংসা করে একটি শ্লোক লিখেছিলেন।

নিয়ম নিষ্ঠা

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীবাহিনীর উদ্দেশ্যে সপ্তাহে তাঁর যে দুটি নির্ধারিত বক্তৃতা ছিল, তাতে তিনি বার্ধ্যক্য ও শারীরিক পীড়াকে উপেক্ষা করেও সময়

১. মাকতূবাত

www.amarboi.org

মতো তাদের উদ্দেশ্যে নিজের মূল্যবান ভাষণ প্রদান করতেন। তিনি শ্রোতাদেরকে বলতেন যে, "তোমরা দুজনে আমাকে ধরে বসিয়ে দেবে এবং আমি বক্তৃতা শুরু করলে আমাকে ছেড়ে দেবে।" তাতে দেখা গেছে যে, তিনি প্রথমে যেখানে দুর্বলতাবশত শরীর টেনে উঠাতে পারতেন না। সেখানে পরে স্বাভাবিকভাবেই বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। তাঁর বক্তৃতায় বহু অমুসলমানও আকৃষ্ট হতো। তাঁর সমালোচনা এমন মার্জিত ছিল যে, তাঁর কথায় কারো মনে কষ্ট নেওয়ার অবকাশ থাকতো না।[১]

উপস্থিত বুদ্ধি

একবার কতিপয় আলিম টমটমে করে দিল্লী রওয়ানা হয়েছিলেন। গাড়োয়ান ছিলো জাতীতে ব্রাহ্মণ। সে আলিমদের প্রশ্ন করে বসলো "আচ্ছা হুযূর সাহেবান, আপনারা আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি? বলুন তো আল্লাহ্ কি হিন্দু না মুসলমান? প্রত্যেকেই বিভিন্নভাবে প্রশ্নটির জবাব দিলেন, কিন্তু কোন জবাবই গাড়োয়ানের মনঃপুত হলো না। অবশেষে তাঁরা গাড়োয়ানকে দিল্লীতে গিয়ে শাহ সাহেবের নিকট থেকে জেনে তার জবাব দানের প্রতিশ্রুতি দেন। দিল্লীতে পৌঁছে গাড়োয়ান নিজেই গিয়ে শাহ সাহেবকে উক্ত প্রশ্নটি করেন। আলিমগণও প্রশ্নটির জবাব দানের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ) গাড়োয়ানকে বললেন, আমি যা বলি তা মনোযোগ দিয়ে শোন। কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ যদি হিন্দু হতেন তা হলে কোন ব্যক্তি গরু জবাই করতে পারতো না। এ কথা তুমি স্বীকার করো কিনা?" গাড়োয়ান তখন লা জওয়াব হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

–(শাহ আবদুল আযীয আওর উনকী তালীমাত)।

---

১. হায়াতে ওয়ালী

www.amarboi.org

পাদরীর সঙ্গে ধর্মীয় বিতর্ক

একবার জনৈক পাদরী ধর্ম সম্পর্কে বাহাস করার জন্য দিল্লী আসেন। শর্ত ছিল, যে কেউ বাহাসে হারবে সে ব্যক্তি দু'হাজার টাকা প্রতিপক্ষকে দেবে। স্থানীয় প্রশাসক বললেন যে, শাহ সাহেব হারলে তাঁর টাকা আমি দেবো। পাদরী বললেন ঃ আমি যে প্রশ্ন করবো যুক্তির মাধ্যমে তার জবাব দিতে হবে–ধর্মীয় গ্রন্থের উদ্ধৃতি দ্বারা নয়। এ কথা সিদ্ধান্ত হবার পর পাদরী জিজ্ঞেস করলেন "আপনাদের পয়গম্বর কি হাবিবুল্লাহ তথা আল্লাহর বন্ধু? "হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর বন্ধু" শাহ সাহেব বললেন। পাদরী বললেন, 'আপনার পয়গম্বর ইমাম হোসাইনের হত্যার সময় আল্লাহর কাছে ফরীয়াদ জানাননি। অথচ বন্ধুর প্রিয়তম অধিক হয়ে থাকেন। তিনি ফরিয়াদ জানালে নিশ্চয় তা শুনতেন।"

শাহ সাহেব জবাব বললেন, "হাঁ, তিনি তো ফরিয়াদ জানাতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঐ সময় এমন অদৃশ্য বাণী আসলো যে, তোমার নাতিকে জাতির লোকেরা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে–এ জন্য তুমি ফরিয়াদ জানাতে যাচ্ছো, অথচ এ মুহূর্তে "আমার ছেলে" ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার কথা আমার মনে পড়ছে।"

এ দাঁতভাঙ্গা জবাবে পাদরী লা–জওয়াব হয়ে গেলেন এবং তার দু'হাজার টাকা প্রদান করতে হলো। এ জাতীয় আরও অসংখ্য ঘটনা শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ)–এর জীবনে দেখা যায়, যেগুলো থেকে তাঁর অপরিসীম আল্লাহ প্রদত্ত উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

www.amarboi.org

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।